পাখিরা জানে

বুদ্ধদেব গুহ

• পাখিরা জানে •

বুদ্ধদেব গুহ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

পাখিরা জানে

আর বড়জোর আধঘণ্টা। সামনের উলঝি সাব-স্টেশনের সিগন্যালে যদি না আটকায় তবে হৃদয়পুরে ট্রেন পৌঁছে যাবে আর আধঘন্টার মধ্যে।

তকাই বলল, তার হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে।

অনিকেত নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল প্রায় বারোটা বাজে। বড় জংশনে গাড়ি বদল করেছিল সকাল নটাতে। তারপর বিহার ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকে আবারও বিহারে ঢুকেছিল কি না তা ও বলতে পারবে না। কারণ, হাইওয়েতে যেমন বোর্ড থাকে, 'উ্য আর লিভিং বিহার অ্যান্ড এনটারিং ওয়েস্ট বেঙ্গল কি ওড়িশা' এবং 'ওয়েলকাম'—সে রকম কোনও বোর্ড-টোর্ড তো থাকে না রেলের ট্র্যাকে তাই নিত্য-যাত্রী ও অভিজ্ঞরা ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোথা দিয়ে চলেছে ট্রেন। আমাদের দেশের তো বটেই পৃথিবীর অনেক দেশেই এক রাজ্য বা এক দেশ থেকে অন্য রাজ্যে পৌঁছলে তাৎক্ষণিক কোনও ভৌগোলিক তফাত চোখে আদৌ পড়ে না।

কী রে। খিদে পেয়েছে নাকি? ভেটকু? অনিকেতের ডাক নাম ভেটকু। তবে সে নামে খুব অল্প মানুষই ডাকে তাকে।

পেয়েছে। তবে তেমন কিছু নয়।

চল। পৌঁছে গেলে স্টেশন থেকে মামাবাড়ি পৌঁছতে বড়জোর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগবে। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসবেন স্টেশনে তাঁর পক্ষীরাজ নিয়ে।

পক্ষীরাজ মানে?

মানে, ছোটমামার জিপ গাড়ি। এখন ছোটমামার। আগে দাদুর ছিল। নাইন্টিন ফিফটিতে আমেরিকান ডিসপোজাল থেকে দাদু কিনেছিলেন। তখন দাদুর শিকারের সখ ছিল। আর তখন এই সমস্ত অঞ্চলেই তো ঘন বন ছিল। পাহাড়, নদী আর পশু-পাখিও ছিল অনেক। চাষাবাদই করা যেত না তাদের উৎপাতের জন্য। তখন শিকার করতে হত বাধ্য হয়ে, প্রাণ ও ধন রক্ষারই জন্য। অতএব, তা দোষের ছিল না। দাদুর মৃত্যুর পরে দাদুর প্রিয় ছোট ছেলে ওয়ারিশন হয়েছে ওই জিপ গাড়ির। একটা আকাশি-নীল রঙা রোভার ছিল, একটা উলসলি গাড়ি, কনভার্টিবল। মানে, ছাদ সরানো যেত। সে সব অন্য মামারা পেয়েছিলেন। দাদুকে আমি দেখিনি। চল্লিশ বছর আগে দাদু মারা গেছেন। তার এক বছর পরে আমার জন্ম। এসবই মায়ের কাছেই শোনা।

ছোটমামা ওই জিপ নিয়েই খুশি। চাষাবাদ এখনও ছোটমামাই সব দেখেন। বিয়ে-থা করেননি। জিপটাকে এখনও এত আদরে রেখেছেন যেন মনে হয় তৃতীয়

পক্ষের বউ। নিজেকে বলেন 'শিক্ষিত চাষা'। বেনারস ইউনিভার্সিটির ইংরেজির এম এ। উর্দু শের-এর রসিক। ভারি ইন্টারেস্টিং মানুষ। আমাদের চেয়ে বয়সে কম করে কুড়ি বছরের বড় হলেও তোর মনে হবে যেন তোর সমবয়সি বন্ধু।

তোর ছোটমামার নাম কী?

ভবতোষ চাটুজ্যে।

তকাই বলল।

তারপর বলল, ছোটমামার নাম ভবতোষ, মেজমামার নাম মহীতোষ আর বড়-মামার নাম আশুতোষ। এই সব 'তোষামোদী' সবই দাদুর কীর্তি। তিনি ছিলেন দেবতোষ। সেটাও ঠাকুর্দার কুকীর্তি।

আর দেবতোষের মেয়েদের নাম? তাও কি সব তোষ দিয়ে?

ভেটুক শুধোল।

বলছি। আশুতোষ মুখুজ্যেদের দেখে টুকলিফাই করেছিল বড়মামা। ওই পরিবারেও যেমন সকলেই হয় 'প্রসাদ' নয় 'তোষ' আমার মামাবাড়িতেও তেমনই। মেজমামা এক সময়ে কাজ করতেন কলকাতার সায়েবদের কোম্পানি ম্যাকিনটোশ অ্যান্ড বার্ন-এ। তাঁর খাস কাজের লোকের নাম ছিল মক্কিচোস। লোকে বলত, হৃদয়পুরের চাটুজ্যেরা নিজেরা তো বটেই, তাদের মনিব এবং চাকরদের এই প্রসাদ আর তোষে-চোষে মুড়ে রেখেছে।

অনিকেত হাসল।

বলল, ইন্টারেস্টিং তো।

আর মেয়েদের বেলা? মেয়েদের নাম বললি না?

তারা সব 'দায়িনী'। শুধু মেয়েরাই নন, নাতনীরাও। প্রাণদায়িনী, মানদায়িনী, প্রেমদায়িনী, এরকম। ভাগ্যিস কারওর নাম প্রাণঘাতিনী রাখেননি। শুধুমাত্র বড়মামার ছোট মেয়েই বিদ্রোহ করেছে। সে তার স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কারওকে না জানিয়ে কলকাতার এক নোটারি পাবলিক-এর কাছে গিয়ে অ্যাফিডেভিট করে নাম পাল্টে করে নিয়েছে হিমিকা।

তার অরিজিনাল নাম কী ছিল?

প্রেমদায়িনী।

জাস্ট ভেবে দ্যাখ। কলকাতাতে প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কথা ছিল, পড়েওছিল। কোনও মেয়ের নাম যদি প্রেমদায়িনী হয় কো-এড কলেজে, তবে তার ঝক্কির কথাটা একবার ভাবত।

হিমিকা! সে তো আরও কিম্ভূত নাম।

অনিকেত বলল।

কেন কিম্ভূত নাম কেন? তুই তো ইলেকট্রনিক্সের এঞ্জিনিয়ার, তুই বাংলা ভাষার কোনও খোঁজই রাখিস না তাই এমন কথা বলছিস। কম্পিউটার-সর্বস্ব তোরা। মাতৃভাষাকে পর্যন্ত বরবাদ করে দিলি। ছ্যাঃ।

মানেটা বল না, আজেবাজে না বকে। তোর চেয়ে ভাল বাংলা জানি আমি।

হিমিকা মানে হচ্ছে কুয়াশা। হিমিকা তো সিম্পল নাম, এ বাড়ির ট্রাডিশন অনুযায়ী ও তো নাম রাখতে পারত নিজের কুজ্ঝটিকাও।

তা অবশ্য ঠিক।

অনি বলল।

বলেই বলল, এই গাছগুলো কী গাছ রে? বড় বড় গাছ, কী সুন্দর সব ফিনফিনে মসৃণ বড় বড় ফুলে ভরা। আর ফুলগুলোর রঙই বা কী সুন্দর। এই লালকে তো গেরুয়া লাল, লামা লাল, সিঁদুরে লাল, ভণ্ডয়া লাল, কিছু বলেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

এতো মাছের রক্ত-ধোয়া জলের মতো লাল।

সাব্বাস!

তকাই বলল।

অনেক লালের কথা শুনেছি আমি আমার আর্টিস্ট বন্ধু সুমন্ত্রর কাছে ক্লিন্তু 'মাছের রক্ত-ধোয়া লালের' কথা কোথাও শুনিনি। 'চাল-ধোয়া জলের মতো সাদা' শুনেছি, 'ফলসার মতো বেগুনি' কিন্তু নাঃ...

গাছগুলোর নামটা বলবি।

অনি এবারে বিরক্ত হয়ে বলল।

এই গাছগুলোর নাম কুসুম। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না? 'কুসুমবনেতে'।

এগুলোই কুসুমগাছ?

ইয়েস, মিস্টার ভেটকু।

এত বড় বড় গাছ হয়?

ইয়েস। আর ফর ইওর ইনফরমেশন, ওগুলো ফুল নয়, পাতা।

পাতা! বলিস কী রে?

ইয়েস। নতুন পাতা। এগুলোকেই বলে, কিশলয়। 'বনময় ওরা কার কথা কয় রে'। এই গানও শুনিসনি?

তুই সব গুলিয়ে দিস না তকাই। এক এক করে বল।

কী আর বলব বল। বছরের এ সময়টা কী তা জানিস?

মার্চের মাঝামাঝি। বাংলা মাসের কথা জানি না।

খুব গর্বের কথা। মাসটা চৈত্র। 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা' শুনিসনি? সেই চৈত্র।

কিন্তু এ হল বসন্ত ঋতুও। তুই তো জল-বসন্ত ছাড়া অন্য বসন্ত কিছু দেখিসনি। আসল বসন্ত তো আজকাল ভদ্রলোকদের হয় না। এই হৃদয়পুরের মানুষদের কাছে আসল বসন্তের নাম চীচক্। মায়ের কাছে এখন শুনেছি যে, যে 'মায়ের দয়া' হলে তখনকার দিনে বাঁচাই কঠিন ছিল। তবে অনেকে বেঁচেও যেত। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু যদি তোকে তেমন করে আক্রমণ করে তবে বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এ চীচক্-এর বাবা। এ তো আর তোদের দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যু নয়। জায়গার নাম হৃদয়পুর। সময়ের নাম বসন্ত, মাসের নাম চৈত্র, এবং পক্ষর

নাম শুক্ল। তুই এবারে মানে মানে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। ফুল, পাখি চাঁদ এরাই হচ্ছে ওই বসন্তর দূত।

দমদম এয়ারপোর্টের কাছেও তো হৃদয়পুর বলে একটা জায়গা আছে।

অনি বলল।

জানি না। থাকতে পারে। তবে হৃদয়ে হৃদয়ে তফাত যেমন থাকে তেমন হৃদয়পুরে হৃদয়পুরেও তফাত থাকে। কোথায় আমাদের মামাদের হৃদয়পুর আর কোথায় ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর। ছাড় তো!

সেটা কী আবার? পক্ষই বা কী? শুক্লই বা কী?

ধন্যি বাঙালি! শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষর নামও শোনোনি। পূর্ণিমা অমাবস্যা? কেন? তোর দাদুর বাত বাড়ে না পূর্ণিমা অমাবস্যাতে?

ঠিক বলেছিস তো। দাদু বলতেন বটে, ওরে ভেটকু, আজ কি অমাবস্যা? দাদুরে আমার, পা-টা একটু টিপে দিবি? পা-টা যে চিবিয়ে খেয়ে নিলে রে!

হ্যাঁ। তবে তো জানিসই। পূর্ণিমার আগে চোদ্দদিন শুক্লপক্ষ আর অমাবস্যার আগের চোদ্দদিন হল কৃষ্ণপক্ষ। বুয়েচ?

তা শুক্লপক্ষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক ছিল না। এবারে হবে। ফুরফুর করে বসন্তর হাওয়া দেবে যখন, মহুয়া আর করৌঞ্জ এবং আরও কত নাম না জানা বনফুলের গন্ধ বয়ে আনবে, যখন হলুদরঙা চাঁদটা উঠবে ভালু-টোংড়ি পাহাড়ের গায়ে শাল আর কুসুমবনের মাথাতে, পিউ-কাঁহা বুকের মধ্যে বারে বারে চমক তুলে 'পিউ কাঁহা' করে ডাকতে থাকবে তখন তোর মনে হবে শাল্লা, কী করতে এলুম এই হৃদয়পুরে। সেই ডাক তোর হৃদয়ে চাবুক মারবে। মন বলবে, 'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল।' তোকে পাহাড়ের ওপরে হৃদি-ঝোড়ার পাশে নিয়ে যাব। তখন দেখবি যে, এই হৃদয়পুরেই তোর হৃদয় খসবে, চৈত্র শেষের শালপাতার মতো, তারপরে ব্যালেরিনার মতো নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে এসে বনের পায়ের কাছের কোনও কালো শিলাসনের ওপরে মুচমুচিয়ে পড়বে। তোর বড়ই বিপদ হবে রে ভেটকু। চাঁদেব বনে যে জীবনের প্রথমবার আসে তার পক্ষে বেঁচে ফিরে যাওয়া মুশকিল। জিন-পরীরা তোকে হয়তো তোর হাত না ধরেই ধরে নিয়ে যাবে, ডাক দেবে নিশির ডাকের মতো, বনের গভীরে নিয়ে যাবে, ডাইনি-জ্যোৎস্নার ভিতরে, তুই আর ফিরে আসতে পারবি না। কলকাতাতে আমি একা ফিরলে, মাসিমা কেঁদে কেঁদে বলবেন, বিধবার একমাত্র ছেলেটাকে কোথায় ফেলে এলে বাবা তকাই? আমার যে আর কেউই নেই।

তকাই বলল।

তারপর সিরিয়াস গলাতে বলল, তবে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাবি কারণ তোর হৃদয় নেবার মতো এখন এখানে কেউই নেই।

ভেটকু বলল, সকলেই তোর মতো সেন্টিমেন্টাল ফুল নয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। চাঁদ, পাখি, বসন্তের হাওয়া, ডাইনি না ফাইনি জ্যোৎস্না, এ সব ফালতু ব্যাপার আমার ওপরে কোনও প্রভাবই ফেলবে না।

তকাই বলল, ঠিক আছে। দেখব, কিন্তু সত্যিই যদি না ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে তুই একটা রামছাগল। মানুষও খুন করতে পারিস। যে মানুষ বসন্ত না ভালবাসে সে অবশ্যই মানুষ খুন করতে পারে।

ট্রেনটার গতি কমে এল। দু পাশেই লাল খাপরার চালের মাটির ঘর, বাঁশের বাখারি বা শালকাঠের খুঁটির বেড়া দেওয়া। কোনও কোনও বাড়ি থেকে উঁচু বাঁশে বা গাছের খুঁটিতে লাল পতাকা উড়ছে দুপুরের হাওয়াতে পত্ পত্ করে।

অনিকেত তা লক্ষ করে বলল, এদিকের মানুষেরা কি সবাই কম্যুনিস্ট নাকি? এত লাল পতাকার ছড়াছড়ি।

তকাই হেসে বলল, এরা কম্যুনিস্টদের যম। শুধু লালে কি কম্যুনিস্ট হয়? কাস্তে হাতুড়ি লাগে না? এরা কম্যুনিস্ট নয়, কম-অনিষ্ট।

মানে? কী বলছিস খুলে বল।

মানে, এই ঝাণ্ডাগুলোর নাম হনুমান-ঝাণ্ডা। আর এই ঝাণ্ডা হচ্ছে রামসেবক হনুমানের। যার ভাল নাম, বজরংবলী।

কী বলি?

বজরংবলী।

তারপর বলল, কম্যুনিস্টদের অনেক কিছুই ভাল কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতবর্ষর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালাই যে ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ যে একটা বিরাট দেশ এবং সেই ভারতবর্ষে রাম তো অনেক বড় ব্যাপার, তার চ্যালা-হনুমানও যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ভারতীয়দের কাছে, এই কথাটার সত্য বুঝতে হলে সারা দেশকে জানতে হবে। কুয়োর ব্যাং হয়ে বসে থাকলে এই জ্ঞানচক্ষু কোনওদিনই উন্মীলিত হবে না।

এসব কথা ছাড়ত। নিয়ে এলি মামাবাড়িতে বেড়াতে। কোথায় তিনটে দিন একটু রিল্যাক্স করব তা নয়...

না, তুই তো আবার কিছু দাদা আর গোদার ভক্ত কিনা! তা তোর দিক দিয়ে ভালই করিস। তোর আখেরে লাভই হবে।

তুই থামত। মাথা ধরে গেল।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। খোলা প্ল্যাটফর্ম। শেড-টেড নেই।

অনি বলল, তুই আজকাল বড় বেশি কথা বলিস। ধান ভানতে শিবের গীত।

তকাই বলল, ওই তো ছোটমামা এসেছেন।

কোন জন?

ওই যে রে। উ্য কাস্ট মিস হিম।

সুভাষ চক্রবর্তী নাকি? এমন মড পোশাকে।

ভাগ।

প্ল্যাটফর্মের আতা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওইটা বুঝি আতা গাছ?

হ্যাঁ।

ওই জিন-এর প্যান্ট, নাইক আর গেঞ্জি, মাথায় হ্যাট আর মুখে সিগার দেওয়া ভদ্রলোক। উনিই তোর ছোটমামা? শিক্ষিত চাষা?

ইয়েস। শিক্ষিত চাষা। এই পোশাকটা ভেক। তোর মতো সাহেবকে রিসিভ করার জন্যেই পরে এসেছেন। তোকে বাজিয়ে নিতে চান আর কী! উনি কিন্তু সত্যিই শিক্ষিত চাষা। আমার ছোটমামার মতো অরিজিনাল, জেনুইন, ভণ্ডামিহীন মানুষ এই দেশে অনেক বেশি সংখ্যাতে থাকলে দেশটার চেহারাই আজ অন্যরকম হয়ে যেত।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। সেই জন্যেই বোধহয় তোর সঙ্গে মিল আছে তোর ছোটমামার।

এটা প্রশংসা না গালি তা বুঝতে পারলাম না। এখন নামত। তার পরে দেখব। তুই পালাবি কোথায় রে ভেটকু। এখন তো আমারই কব্জায়। তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ওভারনাইটার আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা তুলে নিয়ে অনি তকাই-এর পেছন পেছন নামবার জন্যে এগোল।

অনি বলল, এটা আবার কী রকম এক্সপ্রেশন।

আমরা তো বাঙাল। মামারা পশ্চিমবঙ্গীয়। ছেলেবেলাতে গ্রামে শুনেছি এই কথা—'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব'। বহু বছর বাদে ঠোঁটের ডগায় এসে গেল, তাই দেগে দিলাম তোকে।

আয়। আয়। বলে তকাই-এর ছোটমামা ভবতোষ চাটুজ্যে এগিয়ে এলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

এই যে আমার বন্ধু অনিকেত রায়। আর এই আমার ছোটমামা। তোমার কথা ওকে অনেক বলেছি। ওর ডাকনাম ভেটকু।

অনি বলল, আপনার সম্বন্ধে যা বলেছে তকাই ছোটমামা, তাতে তো মনে হচ্ছে আপনার সব সম্পত্তি হাতাবারই মতলবে আছে তকাই। নইলে, এত প্রশংসা কেউ এমনি এমনি করে বলে আমার মনে হয় না।

ভবতোষ বললেন, তোমার অনুমান ভুল। কারণ, এই ভবা চাটুজ্যে মরে গেলে দেখা যাবে তার দেনাই আছে বিস্তর। সম্পত্তি থাকবে না আদৌ। তকাই আমাকে সত্যিই ভালবাসে। এবং ভালবাসা অন্ধ বলেই এ রকম বলে। ওর কথা সিরিয়াসলি নিও না বাবা।

বলেই, পাশেই দাঁড়ানো প্রায় ওদেরই সমবয়সি ছেলেটিকে বললেন, এই সাঁটুল। হাঁ করে কথা গিলছিস কি? মালগুলো নে না অতিথি আর তকাইদার হাত থেকে। সহবত যদি একটুও শিখলি! নতুন মানুষ দেখলেই ভোঁদা বনে যাস তুই।

ওভারনাইটারটা দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ডিজিটাল-লক-এর ব্যাগটা হাতেই রাখল।

ছোটমামা বললেন, ওতে বুঝি টাকা আছে? তা থাকুক। দিয়ে দাও সাঁটুলকে। আমাদের হৃদয়পুরে চোর নেই। সবাই হৃদয়বান এখানে। তাছাড়া সাঁটুল বলতে গেলে, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার।

লজ্জা পেল খুবই অনিকেত। সত্যিই ওর মধ্যে ওর পার্সটা ছিল। হাজার ছয়েক টাকা ছিল। যদিও প্রয়োজন হবে না হয়তো, তবু বাইরে গেলে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। অভ্যাসবশেই।

না, না, মানে, এখানে তো ক্রেডিট কার্ড চলবে না, তাই...

লজ্জিত হয়ে ব্যাগটা সাঁটুলকে দিতে দিতে বলল, অনিকেত।

এখানে ক্রেডিট কার্ড না চললে কোথায় চলবে বৎস? হৃদয়পুরে তুমি তকাই-এর মামাবাড়িতে এসেছ, দু-চোখ বুজে সই কর। তোমার সব সইই এখানে অনার্ড হবে—কোনও লিমিট নেই কিছুরই ওপরে। আনলিমিটেড ক্রেডিট।

হাসল অনিকেত। ভাবল, তকাই-এর ছোটমামা ভারি ওভার-কনফিডেন্ট মানুষ। অন্যে অপ্রতিভ হল কি হল না তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই।

যেন অনিকেতের মনের কথা বুঝতে পেরেই ছোটমামা বললেন, সম্পত্তির ওয়ারিশানের কথা বলছিলে বাবা তুমি, সম্পত্তি বলতে তকাই পেয়েছে আমার টাক আর বুকের চুল। বুকের চুল তো নয়, আমাদের পরিবারের এ বস্তুকে জঙ্গল বলাই ভাল। বড়দার মেয়ে হিমিকা ছেলেবেলাতে আমার পেটের ওপরে বসে বলত, 'থোতোকাকু, তোমার বুক কম্বলে থোব একটু?'

বলেই, বললেন, ভাল কথা, তকাই, তোকে বলাই হয়নি, হিমি এসেছে পরশু।

ও কি এখনও ব্যাঙ্গালোরেই আছে? বম্বেতে ট্রান্সফার হবার কথা ছিল না।

না। এখনও ব্যাঙ্গালোরেই। পনেরো দিনের ছুটিতে এসেছে।

ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পেরিয়ে ওরা যখন আবার প্ল্যাটফর্মে নেমে গেটের দিকে এগোতে লাগল, তকাই বলল, হিমি কি বিয়ে করবে না?

ওসব কথা তুইই ওকে জিজ্ঞেস করিস। আজকালকার সব ছেলেমেয়ে। ওদের কথা, ওরাই জানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল রাতেই খেতে বসে বড়দাকে বলছিল। বড়বউদি তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। হিমি বলছিল যে, বাবা, অল্পবয়সে না বুঝে-সুঝে ওই অপকর্মটি যারা চোখ-কান বুজে ক্যাস্টর অয়েল গেলার মতোই করে ফেলতে পারে তাদের কথা আলাদা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা বাঘ মারার চেয়েও সাহসের কাজ। ভীষণই রিস্কি ব্যাপার। তোমাদের সময় তো আর

নেই। বিয়েটা আর এখন Means to an end নয়। ডিভোর্স হতে কতক্ষণ? তাহলে বিয়ে আদৌ করা কেন?

ভবতোষ ভেটকুর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে কী বৎস?

আজ্ঞে?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে, অনিকেত প্রশ্ন করল।

উনি বিশদ করে বললেন, মানে, তোমার সন্তানাদি কী? 'হাম দোনো, হামারা দোনো' এক ছেলে এক মেয়ে? ব্যস। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমপ্লিট?

অনি অপ্রতিভ হয়ে বোকা বোকা হাসল।

অনিকেত তো বিয়েই করেনি ছোটমামা।

তকাই বলল।

তাই? তারপর বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। স্ট্রেঞ্জই বা বলি কী কেন। বাড়িতেই তো একটি স্যাম্পল আছে।

তারপর বললেন, তা, তোমার বয়স কত হল বাবা?

আটত্রিশ।

চমৎকার।

তকাই বলল, তাতে কী হল? আমারও তো বউ নেই।

সে তো তোর বউ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মরে গেল বলে নেই। আহা! সুমিত্র কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে মনটা খারাপ করে দিলি রে।

তকাই বলল, আচ্ছা ছোটমামা, তুমি নিজে ব্যাচেলর হয়ে বিয়ে বিয়ে করে খেপে উঠলে কেন বল তো? তুমি নিজে কেন ব্যাচেলর থাকলে?

সে কথা তোরা জানিস না? সেই যে কথা আছে না "a bachelor is a souvenir of a woman who had found a better one at the last moment."

তারপর বললেন, না, এই পৃথিবীটার কোনও রোগ হয়েছে। হয় তাই, নয় আমরা সব অবসলিট হয়ে গেছি। তোমাদের কাণ্ড-মাণ্ড ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বুঝি না। মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীকে বড় অচেনা লাগে।

জিপের ড্রাইভিং-সিটে ছোটমামা উঠে বসে তকাই আর ভেটকুকে পাশে বসালেন। ভিতরে তকাই, বাইরে ভেটকু। জিপটার মাথার ওপর ক্যানভাসের চাঁদোয়া থাকার কথা ছিল। সেটা এখন নেই। নেই-ই, না আপাতত খুলে রাখা হয়েছে, তা বুঝতে পারল না তকাই।

ছোটমামা এঞ্জিন স্টার্ট করেই বাঁই বাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগলেন কিন্তু জিপ একটুও ডান দিক বাঁ দিক হল না। স্টিয়ারিং বার দশেক পুরো ঘোরালেন তার পরে টাই-রড কথা বলল স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে। তারপর জিপটা বাঁদিকে মুখ ফেরাল।

ছোটমামা বললেন, দশ পাক ফলস আছে স্টিয়ারিং। এ গাড়ি আমি ছাড়া আর কেউই চালাতে পারবে না। হিন্দিতে একটা কহবৎ আছে না? 'জিসকি বাঁদরী ওহি নাচায়' এও হচ্ছে সেই ব্যাপার। এই জিপের মান-অভিমান-রাগ এসব কোনও কিছুই আমি ছাড়া অন্যে আদৌ বোঝে না।

বলেই বললেন, কীরে তকাই, 'টিকিয়া উড়ান' চালাই?

তকাই বলল, চালাও।

ছোটমামা হ্যাটটাকে পেছনে, মালপত্র সামনে বসে থাকা সাঁটুলের হাতে চালান করে দিয়ে বললেন, আমার তো মাথা ভরা টাক। টিকি থাকলে তবুও না হয়...

তকাই বলল, কহবৎটার মানে বুঝলি?

বোকার মতো ভেটকু বলল, না।

কহবৎ কী?

আরে, কহবৎ হচ্ছে প্রবাদ।

'টিকিয়া উড়ান' চালানো মানে, গাড়ি এতই জোরে চলবে যে ড্রাইভারের টিকিটা উড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে মাথার পেছনে। সেই রকম ড্রাইভিংকেই বলে 'টিকিয়া উড়ান' চালানো।

॥ ২ ॥

খুব ভোরেই উঠে ট্রেন ধরেছিল তাই দুপুরের ভূরিভোজের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিকেত।

তাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে তার জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায় একটি পাহাড়, গভীর জঙ্গলে ভরা। তবে পাহাড়টি কাছে মনে হলেও অবশ্যই অনেক দূরে। তার পাদভূমিতে নানা গাছের জঙ্গল। দুপুরের উথাল পাথাল করা চৈতি হাওয়াটা এখন শান্ত হয়েছে, তবু বনমর্মর শোনা যাচ্ছে মৃদু। বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল অনিকেত। কী সুন্দব এই প্রকৃতি। এক মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছে পাহাড় ও বনকে ছুঁয়ে আসা ওই বাসন্তী হাওয়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও জানালারই সামনে রাখা ইজিচেয়ারটাতে বসল। এই ঘরটা নাকি গেস্ট-রুম। আরও দুটি ঘর আছে এ রকম এই বাংলোতে। তকাই বলছিল।

এখন চারটে বাজে, চারদিক লালে লাল হয়ে রয়েছে। ট্রেন থেকে যে কুসুম গাছ দেখিয়েছিল তকাই সেই গাছও আছে পাহাড়তলিতে অনেকগুলো। আরও নানা গাছে লাল ফুল ফুটেছে। গাছগুলোর একটারও নাম জানে না। জানতে হবে। তকাই-এর মামাবাড়িটি বাংলো ধাঁচের। বাইরে চওড়া বারান্দা। ভিতরেও বারান্দা। বারান্দার পরে উঠোন। উঠোনের ও পাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। কাজের লোকদের থাকার জায়গা।

তকাই-এর মেজমামা মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। তাঁর একই ছেলে। স্টেটস-এর হ্যস্টনে থাকে। বিয়ে করেছে। একটি মাত্র মেয়ে। পুজোর সময়ে আসে। হৃদয়পুরে তকাই-এর মামাবাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয় নাকি সব রীতিনীতি মেনে। সবাই উপোস করেন, অঞ্জলি দেন। পাঁঠাবলিও হয়। হৃদয়পুরে দুটি বারোয়ারি পুজো হলেও ওঁদের বাড়ির পুজো দেখতে বহু দূর দূর থেকে মানুষ আসে নাকি। আসলে কলেজে পড়ার দিন থেকেই তকাই ভেটকুকে মামাবাড়ির পুজোর কথা বলে আসছে। বহুবার যেতে বলেছে কিন্তু আসা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে এল এত বছর পরে। যদিও পুজোর সময়ে নয়। আগে যে কেন আসেনি, তা ভেবে আফসোস হচ্ছে এখন ভেটকুর।

বড়মামা ভারি চমৎকার মানুষ। বয়স হয়েছে। খুব রাশভারি। পাইপ খান। দিনে রাতের অধিকাংশ সময়ই নিজের লাইব্রেরি ঘরে কাটান। হৃদয়পুরের পাবলিক লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদিতেও তাঁদের অনেক দান-ধ্যান আছে। গত বছরই নাকি একটি প্রাথমিক স্কুলের পত্তন করেছেন সরকারের কোনও রকম অনুদান না নিয়েই। ভবিষ্যতেও নেবেন না।

খাওয়ার সময়ে উনি বলছিলেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থারই সবচেয়ে অবনতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবারও। সারা রাজ্যের মানুষের যদি পাঠ্যপুস্তকের মান, শিক্ষকদের মান,

তাদের নিয়োগ এবং বদলি ইত্যাদি নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা না থাকে, তাহলে ভুগবেন তাঁরাই। যথেষ্টই ভুগেছেনও। ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে অনেকদিনই।

রাজ্যে যা হবার হোক, উনি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবেই এই স্কুলের পত্তন করেছেন। তাঁদের বাবা দেবতোষের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায় অবৈতনিক। স্কুলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে ইতিমধ্যেই। কলকাতার দু-তিনটি ভাল প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে সরাসরি সেখানে ভর্তি হতে পারে। সপ্তম শ্রেণী অবধি রেখেছেন তাঁর স্কুলে। সরকারের অ্যাফিলিয়েশন চাননি, অনুদান তো নেনই নি কোন, ভবিষ্যতেও নেবেন না। ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত ধাতের মানুষ। যাকে অন্যায় বলে জেনেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁর যা করণীয় তা একা হাতেই করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের কম্যুনিষ্ট বানানোর চক্রান্তকে অন্তত ঘৃণ্য বলে মনে করেন তিনি। এতে শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে পুরোপুরি এমনই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

হৃদয়পুরের স্কুলের ছেলেমেয়েরা সপ্তম শ্রেণীর পড়াশুনো শেষ করে যাতে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের পরীক্ষাতে বসতে পারে সে বন্দোবস্তও দুটি প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে লিখিত-পড়িত করেছেন। তাঁর স্কুলের ছাত্রদের প্রথম ব্যাচ দু-হাজার আট খৃষ্টাব্দে কলকাতা যাবে। কলকাতাতে তাদের থাকার জন্য এজমালি সম্পত্তি থেকে একটি বাড়ির বন্দোবস্তও করে ফেলেছেন। সেখানেই ছাত্ররা স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা অবধি থাকবে ও খাবে। যাদের অবস্থা তেমন ভাল নয় এবং যারা মেধাবী, তারা যদি সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েও হয়, তবুও তাদের জন্যে হৃদয়পুরের স্কুলে যেমন বিনা পয়সাতে পড়াশুনো, বইপত্রের এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছেন তেমনই কলকাতাতেও তাদের বইপত্র এবং যাবতীয় অন্যান্য খরচের ভার যাতে উনিই নিতে পারেন সে জন্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করে সেই ট্রাস্টে পনেরো লক্ষ টাকা সরিয়ে রেখেছেন। সাত বছর পরে সুদ সমেত সেই টাকা দু-গুণেরও বেশি হবে। সচ্ছল ঘরের ছেলেরা ন্যাশনাল স্কলার হলেও তাদের বৃত্তি দেওয়া হয় না, শুধু সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অল্পবয়সে বৃত্তির টাকা হাতে পাওয়াটা যে কত আনন্দের, তা থেকে সচ্ছল হওয়ার অপরাধে তারা বঞ্চিত থাকে। ওরকম উদ্ভট নিয়ম পৃথিবীর কোথাও আছে বলে জানেন না তিনি।

উনি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছিলেন—রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং 'পূর্ণ মানুষের' সংজ্ঞার কথা বলছিলেন। উনি বলছিলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সব ব্যাপারেই এখন তোষণ-নীতিই একমাত্র নীতি। বড় বড় সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ীদেরও রাজ্যের ভালর জন্যে, দেশের ভালর জন্যে অনেক কিছুই করার ছিল। দেশ ও দশের জন্যে কারওরই কোনও মাথাব্যথা নেই। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর লীলাক্ষেত্র অধিকাংশ বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যে সব ছেলেমেয়ে পড়ে পাশ করে বেরোচ্ছে তাদেরও চরিত্র গঠন, ন্যায়-অন্যায় বোধ, আদর্শ, কিছুই গড়ে উঠছে না। আমাদের সময়ে ও রকম ছিল না। সেই সব ছেলেমেয়েদের মা-বাবারাও অবশ্য সে জন্যে সমান দায়ী। তাঁদেরও তো জীবনের

একমাত্র গন্তব্য শুধুমাত্র চাকরি, বা ব্যবসা বা যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার।

উনি বলছিলেন, আমার একমাত্র মেয়ে হিমিকাকেও এই সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারও কোনও গরজ দেখি না। আমি আর কতদিন বাঁচব? আরও সাত বছর না বাঁচারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমি থাকতে থাকতে এই স্কুলের একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারতাম।

বেড়াতে এসে এমন সব গুরুভার জ্ঞানের মধ্যে পড়ে যাবে ভাবেনি অনিকেত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, কথাগুলো শুনতে আদৌ খারাপ লাগেনি। শুধু যে খারাপ লাগেনি তাই নয়, নিজেদের কথা ভেবে লজ্জিতও বোধ করেছে। তার মনে, জীবন এই প্রথমবার মনে হয়েছে আদর্শহীন জীবনও কি জীবন? পয়েন্টলেস, গন্তব্যহীন জীবনের সার্থকতা কী? মানুষ হয়ে জন্মে শুধু কি খেতে-পরতে, ভাল থাকতে এবং নিজের নিজের আখের গোছাতেই এসেছে এখানে? তাহলে আর ওর সঙ্গে অন্য দশজন ধান্দাবাজ ভণ্ড মানুষের তফাত কী থাকল!

মনের মধ্যে, সত্যি বলতে কী, ঝড় উঠেছে দুপুর থেকেই। বাইরেও চৈতি হাওয়ার ঝড় ছিল কিন্তু সে হাওয়াতে সুগন্ধ ছিল। বুকের মধ্যের এই গম্ভীর ঝড়ে দমবন্ধ হয়ে আসছে। ঝড়ে ঝড়ে তফাত থাকেই!

আজকাল তো আদর্শবান মানুষ দেখাই যায় না। দেশ বা দেশের মানুষকে ভালবাসেন এমন মানুষও নয়। যে যার নিজের ভোগ, নিজের বিলাস, নিজের পরিবারের মানুষদের সুখবিধান নিয়েই ব্যস্ত। টাকা, আরও টাকা, ক্ষমতা আরও ক্ষমতা, প্রাইজ আরও প্রাইজ, এই সবই প্রার্থনা মানুষের। তা তাঁরা চাকরিজীবীই হন, কী ব্যবসায়ী বা পেশাদার বা অধ্যাপক বা সাহিত্যিক। চরিত্র-দূষণ গত কয়েক বছরে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতখানিই ঘটেছে যে, ভাবলে সত্যিই আতঙ্কিত হতে হয়। সবচেয়ে দূষিত আজকাল বুদ্ধিজীবীরা। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এখন কমই আছেন পশ্চিমবঙ্গে। অধিকাংশ দুর্বুদ্ধিজীবী, সুবিধা ও সুযোগজীবী।

অনিকেত জানালার সামনে একটি ইজিচেয়ারে বসে হৃদয়পুরের বসন্তের রূপ দেখতে দেখতে এসব ভাবছিল। এমন সময়ে একটা কোকিল এমন করে ডাকতে লাগল যেন সাপে তার বাসাতে উঠে ডিম খাচ্ছে বলে মনে হল।

দরজায় টোকা দিল কে যেন।

অনিকেত উঠে দরজা খুলতেই তকাই এসে ঢুকল।

বলল, কী রে ভেটকুবাবু, রাতের গাড়িতেই কলকাতা ভেগে পড়বি কি না তাই ভাবছিস বুঝি?

কেন?

না, বড়মামার জ্ঞান হজম করা তো সোজা কথা নয়। সকলে পারে না। দেখলি না, আমাকে না বলে তোকেই সব বললেন।

অনিকেত বলল, কী বলিস তুই! এমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকজন থাকলে দেশের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। তোর দু-মামাই গ্রেট। এমন বাঙালি আমি বেশি দেখিনি।

বলল, সেটা ঠিকই বলেছিস। আই অ্যাম রিয়ালি প্রাউড অফ মাই বড়মামা। অ্যান্ড ছোটমামা অ্যাজ ওয়েল।

বলেইছি তো! তোর ছোটমামাও ভাল। দুজনেই অরিজিনাল মানুষ।

তকাই বলল মেজমামাও চমৎকার মানুষ ছিলেন। উনি এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু কলকাতাতে টাকা কামাবার কল না খুলে এই হৃদয়পুরেই প্র্যাকটিস করতেন। মেজমামার কাছে গরুর গাড়ি, সাইকেল রিকশা, মোটর সাইকেল এবং গাড়ি করে যে কত দূর দূর থেকে রোগীরা আসত, তা বলার নয়। সবাই বলত 'ধন্বন্তরী'। সার্জিকাল কেস খুব একটা নিতেন না কারণ কলকাতার হাসপাতালে যে সব সুবিধা ছিল তা তো এখানে ছিল না। মেডিসিনের প্র্যাকটিসই বেশি করতেন।

রোগীর ভিড়ের ঠেলাতে হিমসিম খেতে দেখে মেজমামাকে বড়মামা আর ছোটমামা মিলে এখানেই আলাদা হাসপাতাল করে দিলেন। অধিকাংশ রোগীর কাছ থেকেই পয়সা নিতেন না মেজমামা। অন্য মামারা, যে সব রোগীরা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাঁদের বলেছিলেন শেষেব দিকে, মানে অসময়ে চলে যাবার আগে, যাঁর যেমন ইচ্ছে ফিজ দিতে। শেষের দিকে অপারেশনও করতেন নিজেদেব হাসপাতালেই। মডার্ন অনেক ইকুইপমেন্টস এনে দিয়েছিলেন অন্য মামারা হৃদয়পুরেই। হৃদয়পুরের হাসপাতালের একতলাতেই মেজমামার নতুন চেম্বার হয়। জুনিয়ার আগে মাত্র একজন ছিলেন হাসপাতালে, পরে মেজমামাকে নিয়ে সবসুদ্ধ দশজন ডাক্তার হলেন। নার্সও এলেন অনেক। একটি নার্সিং স্কুলও করে দিলেন মামারা।

মেজমামা আজকে না থাকলে কী হয়, ডঃ দাশ আর ডঃ মাহাতো কী চমৎকার ঝকঝকে তকতকে রেখেছেন হাসপাতালটি। ওঁরা দুজনেই রেসিডেন্ট। একজন সার্জন আর অন্যজন মেডিসিনের। রোগীরা ধন্য ধন্য করে। ফিজও দেয়। চিকিৎসা বিনিপয়সাতে করা গেলেও সুশ্রূষা করতে তো খরচ লাগেই। তাই এখন হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হন তাঁদের জন্যে একটি ফিজ ধার্য হয়েছে।

কতগুলো কেবিন আর বেড আছে জেনারেল ওয়ার্ডে?

কেবিন-ফেবিন নেই। শুধুই জেনারেল ওয়ার্ড। তবে মেল-ফিমেল ওয়ার্ড অবশ্যই আলাদা। বড়মামার বা মেজমামার তেমন অসুখ হলে ওই জেনারেল ওয়ার্ডের রোগী হিসেবেই চিকিৎসা হয়।

ওঁরা প্রকৃতই সোশালিষ্ট আমাদের নেতাদের মতো নন। ডাবল-স্ট্যাণ্ডার্ড-এর মানুষ নন তাঁরা। তুই যদি সত্যিই দেখতে চাস তো কাল সকালে তোকে সব দেখাব ঘুরিয়ে। কালকে হিমিও থাকবে। ওর তো আজই বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল। এখনও তো এল না দেখছি।

কোথায় গেছে তোর বোন হিমিকা?

সে গেছে দুর্গা পাহাড়ে। সেখানে চিরবাবু 'পাখি-পাহাড়' করছেন না? পাহাড় কেটে ছেনি দিয়ে অগণ্য পাখি আঁকছেন পাহাড়ের গায়ে। তিনি তো এক পাগল।

দেখতে চাস তো নিয়ে যাব। চিরবাবুর ওই প্রজেক্টের জন্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে চাঁদা তুলে নিয়ে এসেছে হিমি। সেই টাকা ড্রাফ্‌ট করে নিয়ে এসেছে, দিতে গেছে চিরবাবুকে। অযোধ্যা পাহাড়েও একজন, সম্ভবত চিত্ত দে এ রকম করছেন বলে শুনেছিলাম। পাহাড়তলির এক আদিবাসী গ্রামে হিমির এক সহেলি থাকে। তার কাছেও যাবে। সেইখানেই বোধহয় আটকে গেছে। মেজমামিমা বলছিলেন, দুপুরে সেখানেই খেয়েদেয়ে আসবে। নিজেই গেছে গাড়ি চালিয়ে। মেজমামার সাদা মারুতি গাড়িটা ওর জন্যেই গ্যারাজে রাখা থাকে। যখন আসে, ওই ব্যবহার করে।

তারপর বলল, চা-টা খাবি না?

খেলে হয়। শুধু চাই যথেষ্ট। বেলা দুটোতে তো অত পদ দিয়ে খেয়ে উঠলাম, 'টা' খাবার জায়গা কোথায়?

তা বললে তো হবে না ভেটকুবাবু। পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। তোর জন্যে তো বটেই হিমির জন্যেও এই তিনদিন বিশেষ ব্যবস্থা হবে খাওয়া-দাওয়ার। বাড়িতে গিন্নি বলতে তো ওই একজনই, কিন্তু মেজমামি একাই একশো। তোর জন্যে মাংসের সিঙাড়া, মাছের কচুরি আর ছানার গজা হচ্ছে 'টা' হিসেবে।

তোর মামাবাড়ির মানুষেরা কি রাক্ষস?

না, তাঁরা সকলেই মিতাহারী। মেজমামি আর ছোটমামা তো নিরামিশাষী। এসবই অতিথির জন্যে। তাছাড়া হিমি অতিথি না হলেও প্রবাসে থাকে, যখন আসে তখন বাবা-হারানো মেয়ের ওপরে সকলেরই স্নেহ স্বাভাবিক কারণেই উপচে পড়ে।

আমার কিন্তু সত্যিই পালাতে হবে। বড়মামা ভাববেন তাঁর জ্ঞান শুনে পালাচ্ছি কিন্তু আসলে পালাব খাওয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচতে।

তকাই বলল, খা, খা। তোর ওপরে অত্যাচার করে যদি অন্যে সুখী হন তবে সে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তোদের বাড়ি গেলে মাসিমাও তো আমাকে কত কি খাওয়ান। প্রাণ গেলেও, ওঁর মুখে হাসি দেখার জন্যে প্রতিবাদ করি কি আমি? তাছাড়া আমার সুমি চলে যাবার পরে আমার নিজের মা তো মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আমার বাড়ি গেলে আমি তো তোকে আলু পোস্ত আর বিউলির ডাল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারি না আজকাল।

ভেটকু বলল, আচ্ছা, সত্যিই তুই একটা বিয়ে কেন করছিস না বলত? বিয়ে একটা করলে, মাসিমা এসে এখানে নিজের দু ভাই আর মেজমামিমার কাছে কত আরামে থাকতে পারতেন। তোর একটা হিল্লে না করে তো ওঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। মাত্র দু-বছরই তো সংসার করেছিলি। তার স্মৃতি কি ভোলা সত্যিই যায় না? তাকে অপমান করা হবে কি আবার বিয়ে করলে?

তকাই একটু চুপ করে থেকে কান খাড়া করে বাইরে কোকিলের ডাকটা শুনেই হেসে ফেলল। বলল, হৃদয়পুরে সত্যিই বসন্ত এসেছে।

কেন?

এই পাগলা কোকিলটাই বসন্তের পেয়াদা। বসন্তে এখানে এখন ডিক্রি জারি করেছে। প্রতি বসন্তে এ আসে এবং পাগলের মতো ডাকতে থাকে। ওই দ্যাখ,

ওই গামহার গাছে ও বাসা বানায়। মেজমামা বেঁচে থাকতে একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা, মেজমামা! তুমি এত রোগীকে ভাল করো, এই কোকিলটার পাগলামি কি ভাল ভরতে পার না?

মেজমামা মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলেছিলেন, সব পাগলকে ভাল করতে নেই।

বলেছিলাম, কেন?

কিছু পাগল সংসারের, সমাজের উপকার করে। পাগল পাখি যেমন করে, পাগল মানুষ তেমনই করে। মাঝে মাঝে আমারই পাগল হয়ে যেতে হচ্ছে হয়। তুই কলকাতার হাসপাতালগুলোর অবস্থা দেখেছিস? বড়লোকেরা না হয় নার্সিংহোমে যান। কিন্তু গরিবেরা? সরকার যদি সত্যিই জনগণেরই হতো তবে জনগণের সরকারি হাসপাতালগুলোর অমন অবস্থা হয়? জনগণের এমন হেনস্তা হয়? নোংরা, খাবারে চুরি, ওষুধে চুরি, চোখে দেখা যায় না। পুরুলিয়ার হাসপাতালের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি খাস রাজধানী কলকাতার হাসপাতালের কথাই বলছি। যদি পাগল হতাম তবে মুখে একটা চোঙা লাগিয়ে পথে পথে ঘুরে কলকাতার হাসপাতালের অবস্থাটা জানাতাম মানুষকে। পাগল নই বলেই পারি না। পাগলদের পাগলই থাকতে দে। তাছাড়া বাঙালিদের সহ্যশক্তিরও শেষ নেই। কী করে মুখ বুজে এই অন্যায় তারা দিনের পর দিন সহ্য করে তা জানি না।

অনিকেত বলল, তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর নতুন ক্যাবিনেট অন্যরকম। মানুষটা সত্যিই অন্যরকম। মনে হয়, উনি কিছু করার চেষ্টা সত্যিই করছেন। তাছাড়া মানুষটি সৎও। দেখাই যাক কী করতে পারেন!

তকাই বলল, তাঁর ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সততা, ঠিক আছে। মানছি। ওই সততা দিয়ে উনি যদি ওঁর সরকারকে সত্যিই স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন তবেই বোঝা যাবে। উনি চেষ্টা অবশ্যই করছেন কিন্তু কতদূর কী করতে পারবেন জানি না। গত পঁচিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতিকে একেবারেই খতম করে দিয়েছেন। খালি কথা আর বক্তৃতা। তাছাড়া সততার তো আরও অনেক রকম আছে। সেই সব ক্ষেত্রেও ওঁর সততা ওঁকে প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া যা দেখছি তাতেও মনে হচ্ছে ওঁর দল ওঁর হাত পা বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে। ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিলে তিনি সত্যিই কি করতে পারবেন করার মতো কিছু?

দাদাবাবু, মা ডাকছেন আপনাদের খাবার ঘরে চা খেতে।

একজন কাজের মেয়ে এসে বলল। সে দুপুরেও ছিল খাবার ঘরে। মামিমাকে সাহায্য করছিল।

চল ভেটকু। বলল, তকাই।

।। ৩ ।।

খাওয়ার ঘরে গিয়ে অনিকেত দেখল, বিরাট আয়োজন। বড়মামা ও ছোটমামাও বসে আছেন খাবার টেবিলে ওদের অপেক্ষায়। মেজমামিমা বললেন, এসো বাবা, বসো।

দশ গাঁয়ের মানুষ যে আপনাদের 'বুর্জোয়া' কেন বলে তা এখন বুঝছি। সত্যি! দুটোর সময়ে খেয়ে উঠে চা-এর সঙ্গে এত পদ খাওয়া যায় বিকেলে।

অনিকেত বলল।

বড়মামা বললেন, বুর্জোয়া আমরা হতে পারি কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকা মেরে বা সরকারি তহবিল কেটে বুর্জোয়া হইনি বাবা। যা কিছু দেখছ এবং দেখবে সবই আমাদের স্বোপার্জিত। আমার বাবার, দাদাদের এবং আমারও। কোনও পার্টি বা দাদা বা গোদার দয়াতে হয়নি কিছুমাত্রই। রবীন্দ্রনাথও তো বুর্জোয়া। এই হা-ভাতেদের দেশে, নিশ্চেষ্টদের দেশে, মতলববাজদের দেশে যেই একটু ভাল থাকে, ভাল খায়, সেই বুর্জোয়া। কে কী বলল, তাতে আমাদের বয়েই গেল। আমরা বুর্জোয়াই থাকতে চাই। সবকিছুর জনগনায়ন আমরা কেউই সমর্থন করি না। এতে দেশের ক্ষতি যতখানি হয়েছে ভাল তার ছিটেফোঁটাও হয়নি।

ছোটমামা বললেন।

মামিমা বললেন, ঠাকুরঝির চিঠি এসেছে রে তকাই আজই দুপুরে। কতবার বলি হপ্তাতে একটা ফোন কোরো। তা নয়, ঠাকুরঝি আমার চিঠি লিখতে খুবই ভালবাসে আর চিঠি লেখেও ভারি সুন্দর। আমার শাশুড়ি মা মেয়েকে নিজে হাতে বাংলা পড়তে-লিখতে শিখিয়েছেন। বুঝলে বাবা অনিকেত, এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম পাটনা থেকে এ আমার পরম সৌভাগ্য। অমন দেবতুল্য শ্বশুর, শাশুড়ি-মা, দেবতুল্য ভাসুর এবং নিজের সহোদরের চেয়েও বেশি কাছের আমার একমাত্র দেওর এই ভবা।

তারপরেই বললেন তকাইকে, তকাই, 'ভেটকু' আবার কী নাম? এমন সুন্দর ছেলের নাম ভেটকু হল কী করে! দিদির চিঠিতে জানলাম যে ওর নাম ভেটকু।

সুন্দর বলেই হয়তো ছেলেবেলাতে কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে প্যারামবুলেটরে করে ছেলেকে বেড়াতে পাঠাতেন মাসিমা পাছে আরও কারও নজর লাগে, তাই হয়তো একটা বিচ্ছিরি নাম দিয়েছিলেন, 'ভেটকু'।

সকলেই হেসে উঠলেন তকাই-এর কথাতে।

মেজমামিমা স্বগতোক্তি করলেন, হিমিটা এখনও এল না। বলি যে দু-দুজন ড্রাইভার বসে আছে, একজনকে নিয়ে যা, তা না, মেয়ের জেদ। সে বলে, ব্যাঙ্গালোরে কি আমার ড্রাইভার আছে? নিজেই তো চালাই হয়। আর এখানে নিজের জায়গাতে এবং এমন ফাঁকা জায়গাতে গাড়ি চালানোটা তো একটা আনন্দই।

কষ্ট তো একটুও নেই।

পরক্ষণেই মামিমা বললেন, বুঝলি তকাই, অনিকেত সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন ঠাকুরঝি। তোমার যে এত রকম গুণ তা তো তকাই আমাদের কখনও বলেনি। বাবা তোমরা দুজনে তো এতদিনের বন্ধু, আগে এলে না কেন? এত বছর লাগল এটুকু পথ এসে পৌঁছতে?

অনিকেত বলল, তকাই যে আমাকে ঈর্ষা করে। তাই বলেনি মামিমা। তাছাড়া ভাল করে আসতে বললে তো আসব। আমি এলে ওর যত্ন-আত্তি যদি কম হয়ে যায় এই ভয়েই হয়তো নিয়ে আসেনি এতদিন।

তারপরই বলল, গুণ না ছাই। মা-মাসির চোখে সব ছেলেই গুণের আধার। আর মাসিমা, মানে, তকাইয়ের মায়ের মুখে তো আমি কারওরই নিন্দা শুনিনি আজ অবধি। এমনকী ভুলেও কখনও জ্যোতি বসুরও নিন্দা করেননি। তাই মাসিমার প্রশংসার সার্টিফিকেটের কোনোই দাম নেই।

মাছের কচুরি ভেঙে আদার আচার দিয়ে খেতে খেতে তকাই বলল, কী ছোটমামা, আমার বন্ধুতো শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষর তফাত বোঝে না। তাকে ভালু-টোংড়িতে নিয়ে গিয়ে হৃদি-ঝোড়ার পাশে বসিয়ে এই বাসন্তী রাতের রূপ দেখাবে না?

আজ আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারব না। তবে বন্দোবস্ত সব করে রেখেছি। আমি বোধহয় তোর মন পড়তে পারি। সাঁটুলকে সঙ্গে নিয়ে যা। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে হিমির সঙ্গে। সে এসে গেলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। সেও যেতে পারত। আমিও যেতাম।

তা তো পারতই।

তারপর বলল, তোমার জিপটাই নিয়ে যাব কি?

একদম না। ওই আমার একমাত্র স্ত্রী। বহু পুরনো স্ত্রী। এমন চাঁদের রাতে বনপাহাড়ে দুজন যুবকের হাতে তাকে আমি ছাড়তে একেবারেই রাজি নই। বড়দার ফোর্ড-আইকনটা নিয়ে যা তোরা।

তুমি যা বলবে।

বড়মামা বললেন, কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ অনিকেত?

বড়মামার চা খাওয়া হয়ে গেছিল। তখন পাইপ খাচ্ছিলেন। পাইপের টোব্যাকোর গন্ধে খাওয়ার ঘরটা ভরে ছিল।

অনিকেত বলল, তিনদিনের। মানে, পরশু অবধি।

দোল অবধি থেকে যেতে পারবে না? এখানের দোল দেখার জিনিস। তোমাকে আমাদের ফার্ম হাউসে নিয়ে যাব। আমাদের যারা ভালবাসে সেই সব গ্রামীণ ও আদিবাসী মানুষেরা সকালে দোল খেলতে আসবে আর রাতে নাচ-গান করবে। তা বলে ভেবো না যে ভদ্রলোকেরা আমাদের ত্যাগ করেছেন। না, তাঁরাও আসবেন অনেকে। তবে সত্যি কথা বলতে কি অশিক্ষিত মানুষজনই আমার বেশি ভাল লাগে। এদেশে যাঁরাই শিক্ষিত হন তাঁদের অধিকাংশই কপট মতলববাজ এবং চোর। এ বড় দুঃখের কথা। তবু, তাঁদের বাদ দিয়েও তো সমাজ চলে না।

কীর্তন হবে দোলের আগের রাতে ঠাকুর-দালানে।

মেজমামিমা বললেন।

কে গাইবেন কীর্তন?

অনিকেত জিজ্ঞাসা করল।

নিমীলা রায়। বড় ভাল গান বলে শুনেছি। নবদ্বীপ থেকে তিনি আসবেন আগের দিন। ছবি ব্যানার্জির কাছে নাকি শিখেছিলেন। সত্যি! ছবিদি গান গাওয়া তো প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য। তেমন কীর্তনীয়া তো আর কেউই নেই, কী পুরুষ কী মেয়ে।

মেজমামিমা বললেন, অনিকেতের পাতে মাংসের সিঙাড়া তুলে দিতে দিতে।

শুনতে পাই, কীর্তন নাকি ধর্মীয় সঙ্গীত। তাই এই "ধর্মনিরপেক্ষ" রাজ্যে কীর্তনের উন্নতিকল্পে সরকারের পক্ষে কিছু করাটাও নাকি সম্ভব নয়। বাংলার এত বড় একটা সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে চোখের সামনে। অথচ...

বড়মামা বললেন।

এখন তো পুজো করা, পার্বণ মানা, ধর্মাচরণ করাটাও আউট অফ ফ্যাশন। বুদ্ধিজীবীদের "ইমেজ"-এর পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রাইজ পাওয়ার পক্ষে অসুবিধের। দুর্গাপুজোতে অঞ্জলি দেওয়াটাও তো এখন অন্ধ কুসংস্কার।

ছোটমামা বললেন।

বড়মামা বললেন, এখন মন্ত্রীদের এবং রাজনীতিকদের ফ্যাশন হচ্ছে রমজানের শেষে মাথাতে রুমাল চাপিয়ে ইফতার পার্টিতে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া। সেটা কুসংস্কার নয়। তা করাটা গর্বের ব্যাপার।

অনিকেত বলল, একটা উপন্যাস আমাদের পড়া উচিত। আপনাদের যা মানসিকতা তাতে অবশ্যই ভাল লাগবে।

কোন উপন্যাস?

চাপরাশ। ঈশ্বরের চাপরাশ যাঁরা বহন করেন সেই চাপরাশিদের নিয়েই লেখা ওই বইটি।

ছোটমামা বললেন, একটা পাঠিয়ে দিস তো তকাই। তুই তো কালাপাহাড়। তুই তো পড়বি না।

ওই বইটা পড়েছি। ইন্টারেস্টিং বই। তবে আমি তো অ্যাথেইস্ট। দেব তোমাদের পাঠিয়ে। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই।

॥ ৪ ॥

চা-টা খেয়ে ওরা যখন বেরোল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে।

তকাই স্টিয়ারিং-এ বসল, পাশে ভেটকু। পেছনে-বসা সাঁটুলকে তকাই বলল, জলের বোতল আর টর্চ নিয়েছিস তো সাঁটুল সঙ্গে।

হ্যাঁ তকাইদা।

আর বন্দুক?

নিলে ভাল হত তবে বন্দুক নিইনি। ছোট যন্তর আছে আমার কোমরে। দিনকাল তো ভাল নয়। ছোটবাবু ডি. এম.-কে বলে ছোটবাবুর বডি-গার্ড হিসেবে আমার একটা লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন।

এখন দেশে যাদেরই লাইসেন্‌স্‌ড আর্মস আছে তাদেরই বিপদ। এদিকে কার কাছে যে আর্মস নেই, মায় এ. কে. ফর্টিসেভেন পর্যন্ত, তা ঈশ্বরই জানেন। কোথা থেকে আসছে, কারা তা সংগ্রহ করছে, সে বিষয়ে কোনওই মাথাব্যথা নেই পুলিশের। ডাকাতি-কিডন্যাপিং লেগেই আছে। কারা ও সব করছে তাদের নাম তো কাগজে রোজই বেরোচ্ছে কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্টের তাতেও কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা এক আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছি। উই আর লিভিং ইনা আ ওয়ার্লড অফ উইশফুল ফিকিং। ভবিষ্যৎ অত্যন্তই খারাপ পশ্চিমবঙ্গের। অত্যন্তই খারাপ।

অনি বলল, এলাম এখানে বেড়াতে আর তোরা মামারা আর বোনপো মিলে কী শুরু করলি বলত? দেশ দেশ করে মাথা খারাপ করে দিলি। বলেই বলল, যোগেন একটা প্রবাদবাক্য বলে না?

কী?

"মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নেই সেখানে।" প্রবাদটি যে কত বড় সত্য এখন তা বুঝছি।

যোগেনরা কি বাঙাল? 'ভাগ্নে', 'ভাস্তে' এসব বলে কেন? বোনঝি বোনপোকে? বলে। এক এক জায়গায় এক এক রকম বুলি। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। তকাই বলল।

তারপর সাঁটুলকে বলল, কী রে। কোমরে তো যন্ত্র গুঁজেছিস কিন্তু সেটা কি শুধুই দর্শনধারী? না চালাতেও শিখেছিস। চালাতে না জানলে এসব যন্ত্র যারা প্রকৃত যন্ত্রী তারা গালে থাপ্পড় মেরে কোমর থেকে খুলে নিয়ে যাবে। কী যন্ত্র তোর? কত বোরের?

ওয়েবলি স্কট। ইংলিশ। রিভলবার। পয়েন্ট থ্রি-টু। বড়মামার নামে ছিল আমার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন।

ছোটমামার নিজের নেই?

আছে না? কোল্ট পিস্তল। আমেরিকান। পয়েন্ট থ্রি টু ই।

মাঝে মাঝে হাত ঠিক করেন তো? তুই করিস?

হ্যাঁ। করে তো। আমিও করি। ওই ভালু-টেংড়িতে গিয়েই করি।

ভালু-টোংড়িতে ভালু আছে এখনও? নাকি ছোটমামা আর তোর গুলির আওয়াজে সব ভাগলবা হয়েছে?

না, না, অনেক আছে। পেছন দিকের পাহাড়টাতে যে অনেকগুলো বড় বড় গুহা আছে। সেখানে থাকে। গাবলু-গুবলু বাচ্চারাও থাকে।

তকাই বলল, বাচ্চারা কি আর চিরকাল গাবলু-গুবলু থাকে। আমি-তুই সকলেই তো শিশুকালে গাবলু-গুবলুই ছিলাম। আমাদেরও তো ধেড়ে হতে হল। ওরাও ধেড়ে হয়ে যাবে। অবশ্য ওদেরও গাবলু-গুবলু বাচ্চা হবে।

সাঁটুল বলল, কপালে থাকলে আজই দেখা হয়ে যেতে পারে। এখন তো মহুয়ার সময়। এখনই তো ওদের দেখতে পাওয়া ভারী সহজ।

মহুয়া কী রে?

ভেটকু বলল।

তোকে নিয়ে চলে না। কলকাত্তাইয়া বাবু। দাঁড়া। তোকে মহুয়া দেখাই আর মহুয়া শোঁকাই।

বলেই, গাড়িটা পাহাড়ে পাহাড়ে যাবার লাল মাটির পথে দাঁড় করাল।

সাঁটুল বলল, এখানে না দাঁড়িয়ে একটু আগেই মোড়ে দাঁড়ালে ভাল হবে।

কেন?

ওখানে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ আছে। তাছাড়া দিদি যদি ফেরে অযোধ্যা পাহাড় থেকে তবে ওই মোড়েই দিদির সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। যদি দিদি পরে, বলে, আমাকে ফেলে চলে গেলি কেন তোরা?

তকাই বলল, ভাগ। তোর দিদি তো থাকবে এখনও অনেকদিন। আমার বন্ধু তো চলে যাবে দুদিন পরেই। তোর দিদির সঙ্গে আমাদের কী?

কিছু না। তবে যদির কথা ভেবে মা দিদির জন্যে হটকেস-এ মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া দিয়ে দিয়েছেন। ন্যাপকিন, প্লেট, কাঁটা-চামচ সব। জলও আছে। ফ্লাস্কে কফিও আছে।

তোর জন্যে কিছু দেননি মামিমা?

দেননি আবার? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হল, আমার খাওয়া হল না বলেই তো আমার ভাগটাও দিয়ে দিয়েছেন। দিদির সঙ্গে দেখা হলে ভাল। নইলে তো সব আমার পেটেই যাবে।

খেয়ে খেয়ে তো একটা রাক্ষস হয়েছিস।

দেবতা পাহারা দিতে রাক্ষসদেরও দরকার।

কথাও তো শিখেছিস দেখছি অনেক। গত বছর যখন পুজোতে এসেছিলাম তখন তো সাত চড়ে মুখ দিয়ে 'রা'ও বেরতো না।

হেঁ। তখন কি আর ভালু-টোংড়িতে এসেছিলাম তকাইদা। বড়বাবুদের সামনে আর মায়ের সামনে আমি বোবা হয়েই থাকি।

আর ছোটবাবু?

ছোটবাবু বন্ধুর মতো। শুধু আমারই নয়, উনি সকলেরই বন্ধু। ছোটবাবু যে দিন মরে যাবেন সে দিন কত হাজার যে লোক হবে তা ভেবেই আমি আনন্দে আটখানা হয়ে যাই।

তকাই বলল, কথা শুনলি ভেটকু?

তারপর সামনের মোড়ে পৌঁছে গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোটমামার মরেও দরকার নেই আর তোরও আনন্দে আটখানা হবার দরকার নেই। নাম এবারে। আমার বন্ধুকে সব গাছ-টাছ চেনা। শুধু মহুয়া গাছই নয়।

গাড়ি থেকে নেমে জোরে নাক টেনে প্রশ্বাস নিয়ে তকাই বলল, না। যখন পাহাড়ে উঠব, কাচ নামিয়ে নেব। এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে বসে বনের শব্দ-গন্ধ কিছুই উপভোগ করা যায় না।

দরজাটা বন্ধ করে বলল, মেজমামি তো তোর জন্যে আর হিমি দিদির জন্যে অনেক কিছুই দিলেন তা আমার ছোটমামা আমার আর আমার বন্ধুর জন্যে কিছু দেননি রে সাঁটুল?

সঙ্গে সঙ্গে সাঁটুলের থার্টি-টু অল আউট হয়ে গেল।

সব দাঁত বের করে বলল, তা কি আর না দিয়েছেন? মামা-ভাগ্নে বলে কথা।

কী দিয়েছেন?

আজ্ঞে রাম্। ছোটবাবু বললেন, তকাইটা একটা হনুমান। রাম্-এ বড় ভক্তি। তার বন্ধু তো ওর মতো হনুমান নাও হতে পারে, হয়তো খায়ই না। যদি খায় তো জেনে আমাকে বলিস কাল ওর জন্যে একটা সিভাস-রিগ্যাল দেব। হুইস্কি। গত মাসে কলকাতা যখন যাই তখন পার্ক স্ট্রিটের জুবিলি স্টোর্স-এর পল্লব ব্যানার্জি দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও বিশেষ উপলক্ষর জন্যে জমিয়ে রেখেছিলাম। তা, বলিস আমাকে।

যে মক্কেল এসব খায় না তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হত না। তবে আমার বন্ধু খুব বড়লোক তো! আজে বাজে জিনিস খায় না। ছোটমামাকে বলিস। ও রাম্ খেলে বাকার্ডি রাম্ খায়।

সেটা আবার কী?

সাদা রাম্।

রাম্ সাদা? অবাক হয়ে বলল সাঁটুল। কখনও দেখিনি তো।

থাম তো। এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানিস তুই? আমিই বা কতটুকু জানি। তবে হ্যাঁ যতটুকু জানিস তাই দেখা এবং শোনা আমার বন্ধুকে।

ভেটকু বলল, যোগেনের প্রবাদটা সত্যিই একশোতে একশো পাবে।

দেখা দেখা, বাবুকে মহুয়া গাছ দেখা। গাছ গাছালি সব চিনিয়ে দে কলকাতার বাবুকে।

হ্যাঁ। ওই যে বাবু। ওই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ওই সবগুলো গাছই মহুয়া। গন্ধ পাচ্ছেন না হাওয়ায় একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?

হ্যাঁ। তাই তো। ভারি মিষ্টি তো গন্ধটা।

মিষ্টি তো হবেই বাবু। এ দিয়ে তো মদ তৈরি হয়।

ও হ্যাঁ। সে তো শুনেছি। নানা বইয়ে পড়েওছি।

আর ওই যে গন্ধটা...

কোন গন্ধ ...

মহুয়ার থেকে আলাদা গন্ধ, পাচ্ছেন না? ওটা হচ্ছে করৌঞ্জের গন্ধ।

তকাই বলল, আরে প্রথম দিনই কি গন্ধর ফারাক করতে পারবে? বার বার আসবে যখন তখন পারবে। সবাই কি গন্ধ-গোকুল?

বার বার আসবেন বুঝি বাবু? এলে তো ভারি ভাল হয়। মা, তাই বলছিলেন।

মামিমা? কী বলছিলেন?

তকাই জিজ্ঞেস করল।

বলছিলেন...।

বলেই, তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, না, না, কিছু না...

তকাই ধমকে বলল, কিছুই না যখন তখন বলতে গেলি কেন?

আমার চাকরি চলে যাবে। মানে, বললে, আমার চাকরি চলে যাবে।

তোর চাকরি, আমাকে না বললে, আমিই ছোটমামাকে বলে খেয়ে দেব। কী বলছিলেন মামিমা, তাই বল?

বলব?

আঃ! কী ন্যাকামি হচ্ছে।

বলছিলেন যে, হিমিদিদির যদি এমন একটা বর থাকত, কী ভালই না হত। একেবারে সৌমিত্র চ্যাটার্জির মতো, মানে যৌবনের। ভদ্র সভ্য, কম কথা বলে, তাছাড়া কত বিদ্বান এবং বড়লোক।

তকাই খুবই লজ্জা পেল ভেটকুর সামনে। কথাটা যে এই, তা আগে জানলে জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না।

ও অস্ফুটে বলল, সরি ভেটকু।

অনিকেত বলল, কী যে বলিস।

কিছু মনে করিস না।

এতে মনে করার কী আছে বল? আমি কি বোকা না পাগল?

আমার বিধবা মামিমার যদি তোকে খুবই ভাল লেগে গিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দিস।

দ্যাখ তকাই। বাড়াবাড়ি করিস না। জীবনে আমাকে যদি একজনের ভালই লেগে থাকে সে তো পরম আনন্দেরই কথা। মামিমার ভাল লাগলে যে তোর বোনেরও ভাল লাগবে আমাকে এমন কোনও মানে নেই। তাছাড়া যদি আমাদের দুজনের দুজনকে ভাল লেগেই যায় তবেও বিয়ে হবার কোনও সম্ভাবনা কষ্ট-কল্পনা। আমরা দুজনেই যদি এতগুলো বছর বিয়ে না করে থাকতে পারি নিজ নিজ নিজস্ব কারণে তাহলে দুজনেই হঠাৎ বিয়ে করে ফেলব একে অন্যকে সেটাও সুদূরপরাহত।

মাসিমাকে দোষ দেবার প্রশ্নই হয় না। বরং আমি রীতিমত যাকে বলে elated। আমি নিজেই মামিমাকে বলব গিয়ে প্রণাম করে যে, আমি সম্মানিত বোধ করছি।

তকাই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে বলল, নে ভেটকু, খাবি না কি?

নো। নেভার। কী করে যে শিক্ষিত মানুষ হয়ে এখনও সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিস ভাবতে পর্যন্ত পারি না। গত সপ্তাহেই বস্টনে যেতে হয়েছিল দুদিনের জন্যে। অত বড় এয়ারপোর্টে দেখি একটি ছ বাই ছ ফিট-এর এনক্লোজার। তার চারধারে দড়ি দেওয়া। দেওয়ালে লেখা আছে Smokers। দুজন মাত্র দেখলাম, তোরই মতো অ্যাডিক্ট। তার মধ্যে ঢুকে একজন সিগারেট আর অন্যজন পাইপ খাচ্ছেন আর পুরো এয়ারপোর্টের মানুষে গ্রামের মেলাতে যেমন চোখ-মুখ করে তাঁবুর মধ্যে টিকিট কেটে ঢুকে চার পা-ওয়ালা ছেলে বা তিন মাথা-ওয়ালা মেয়ে দেখে, তেমন চোখ করেই তাদের দিকে চেয়ে আছে। ছিঃ।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

তকাই বলল।

তারপর বলল, আমার মামাদের জ্ঞান দিয়ে পাইপ আর সিগার খাওয়া ছাড়াতে যদি পারিস তাহলে আমিও ছেড়ে দেব। প্রমিস।

ভেটকু সাঁটুলকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী গাছ?

ওই গাছটার নাম ফাগুন বউ। অনেকে বসন্তিও বলে। এই সময়েই ফুল আসে ওদের। সুন্দর হলুদ ফুল হয়েছে দেখেছেন। পাতা ঝরে যায় এখন। শুধু ফুলগুলো থাকে, কী সুন্দর যে দেখায়। সুন্দর দেখাচ্ছে না। ওই দেখুন, ওদিকে নীল কৃষ্ণচূড়া। বেগুনি জাকারান্ডা। সবই এই সময়েই ফোটে। আর ওই সাদা সাদা কাগজের মতো ফুল যে গাছটাতে, ওটা অস্ট্রেলিয়ান গাছ। ওদের নাম সুপার্বা গ্লিনিসিডিয়া।

ভেটকু সাঁটুলের জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বলল, আঙুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে, ও গাছগুলো কী গাছ?

তকাই স্বগতোক্তি করল, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়'।

তুই চিনিস?

শান্তিনিকেতনে দেখেছিলাম।

ওগুলো তো শিরিষই। সাদা শিরিষ আর কালো শিরিষ। দু'রকমের হয়। আর ওইটা হচ্ছে আফ্রিকান টিউলিপ।

সাঁটুল, তুমি জানলে এত কী করে?

ছোটবাবুর কাছেই শিখেছি। মাও অনেক গাছ চেনেন। এসব গাছের অধিকাংশই তো ছোটবাবুরই লাগানো।

তাই? এই সব জমিও কি ওঁদের?

জমি? না তো। জমি তো বনবিভাগের।

তবে?

আনন্দ করে, ভালবেসে নিজের পয়সা খরচ করে গাছ লাগিয়ে বনকে আরও

সুন্দর করছেন ওঁরা, বনবিভাগ আপত্তি করবেন কেন? তাছাড়া, বনবিভাগের সাহেবরা সবাই তো আসেন আমাদের ওখানে। গত সপ্তাহেই রাহা সাহেব এসেছিলেন?

কে তিনি?

অতনু রাহা। চিফ কনজার্ভেটর, পার্কস। মানে, পশ্চিমবঙ্গের সব ন্যাশনাল পার্ক, টাইগার প্রজেক্ট শুদ্ধু তাঁরই এক্তিয়ারে।

কিন্তু ঠিক এই জায়গাটা কি পশ্চিমবঙ্গ?

সেটাই তো মজা। আমরা বাংলা-বিহারী, থুড়ি, ঝাড়খণ্ডী। আমরা ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি, ছোটবাবু বলেন। দু'পা এগোলেই পশ্চিমবঙ্গ আর দু'পা পেছলেই ঝাড়খণ্ড।

তুমি এত সব জানলে কী করে।

সবই বাবুদের কাছে শিখেছি। পনেরো বছর তো হয়ে গেল চাকরির।

এখন তোমার বয়স কত?

চৌত্রিশ। দিদি আর আমি সমবয়সি।

বলেই বলল, আচ্ছা এটা কী গাছ বলুন তো?

কোনটা?

ওই যে লাল ফুল ফুটেছে।

আমি গাছ-টাছ চিনিনা। আমি কি বনবিভাগের আমলা?

তারপরে বলল, কী গাছ এটা? অশোক?

না।

পলাশ?

না।

তবে? শিমুল?

তাও নয়।

তবে?

ওটা মাদার। মাদার খুব জল খায়। মাদার বাংলাতেই ভাল হয়। এসব জায়গা তো রুখুসুখু। সেইজন্যেই এ পথ দিয়ে যখনই যাই আমি, ছোটবাবুর অর্ডার আছে, পলিথিনের জ্যারিকেনে জল রাখি গাড়িতে সব সময়ে। জল ঢেলে দিয়ে যাই। এখন থেকে আগামী তিনমাস নিয়মিত জল দিতে হবে। তারপরে বলল, দূরে আঙুল দেখিয়ে, ওই হল গিয়ে শিমুল। কত বড় বড় হয় গাছগুলো, দেখেছেন? গুঁড়িটাতে কেমন ভাগ ভাগ আছে দেখেছেন? আর সারা গায়ে কাঁটা। এই শিমুলের ফুল এখনই তো আসে—যে দিকে তাকাবেন লালে লাল। পলাশে আর শিমুলে। তবে পলাশ এদিকে বেশি হয়। বাড়ও খুব। সব গাছেরই আশেপাশে চারা গজিয়ে যায়। পলাশ না থাকলে গরিব মানুষদের হাঁড়ি চড়ত না। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। পলাশ একেবারে রাবণের গুষ্টি। যতই কাটা হোক না কেন সমানে বাড়ে, সমানে গজায় বিনা আদর-যত্নে।

তারপর একটু থেমে বলল সাঁটুল, শিমুলের ফুল কোটরা হরিণরা খুব ভালবেসে

খায়।

এখানে হরিণ আসে নাকি?

এখন নামে না, আমাদের ছেলেবেলাতে তো এখানে গভীর বন ছিল, তখন দূরে দেখেছি। এখনও আছে, তবে পাহাড়ের ওপরের ঘন জঙ্গলে। ভালু-টোংরিতে আছে।

আর শিমুলের মগডালে যে বড় কালো পাখিটা বসে আছে সেটা কী পাখি বলুন তো?

তকাই বলল, তুই কি আমার বন্ধুর পরীক্ষা নিচ্ছিস না কি?

সাঁটুল হেসে ফেলল। তারপর জিভ বের করে দু কানে হাত দিল।

অনি বলল, আমি জানি না, কী পাখি ওটা?

ওটা এক ধরনের ঈগল। এর নাম, শাবাজ। এরা একাই থাকতে ভালবাসে। অদ্ভুত ডাক ওদের - কি - কি - কিই করে।

এদের ইংরেজি নাম Crested Hawk Eagle।

তকাই বলল।

সাঁটুল বলল, আপনাকে ওই যে আফ্রিকান টিউলিপ দেখালাম তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দিয়েছিলেন নাকি আকাশমনি। এখন আকাশমণি বলেই সকলে চেনে ওই গাছকে। আরও কত ...

বলেই, থেমে গেল সাঁটুল।

স্বগতোক্তি করল, ওই তো দিদি আসছেন।

জীবনে নার্ভাস ফিল করেছে খুব কমই অনিকেত। কিন্তু লাল ধুলো উড়িয়ে একটা সাদা ছোট মারুতিকে আসতে দেখে কে জানে কেন, ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ও একটা ফেডেড জিনস, গল্ফ খেলার হলুদ রঙা গেঞ্জি আর জগিং শু পরেছিল।

তকাই মুখ তুলে অনিকেতের মুখে চাইল একঝলক, অনিকেতের নাড়ি বুঝতে।

অনিকেত টের পেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দেখতে দেখতে গাড়িটা ওদের গাড়ির কাছে এসে গেল। পথের উল্টোদিকে গাড়িটাকে পার্ক করে রেখে হিমিকা চট্টোপাধ্যায় নামল। একটা ফিকে বেগুনি রঙা শাড়ি, স্লিভলেস, সাদা ব্লাউজ এবং কোলাপুরি চটি পরে। গলাতে সাদা ঝুটো মুক্তোর মটরদানার হার, দু হাতে ওই রকমই মটরবালা, দুকানে মুক্তোর ইয়ার-টপ, হাতে সাদা রঙা স্ট্র্যাপে বাঁধা কালো ডায়ালের ঘড়ি, চোখে রে-ব্যানের রোদ চশমা। মেয়েটি বেশ লম্বা তাই আজকালকার অনেক মেয়েরই মতো লম্বা হবার জন্যে দু-ইঞ্চি রাবার হিলের জুতো পরতে হয়নি তাকে।

চোখ থেকে রোদ-চশমাটা খুলে ফেলে তকাইকে বলল, কী রে তকুদা। তুই তো ভুলেই গেছিস আমাদের। Long time no see!

তকাই বলল, তা তো বটেই। অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ডিফেন্স। আমি তো প্রায়ই আসি, যে, বাড়ির মেয়ে, তাকেই দেখতে পাই না।

আর বলিস না রে। যা বিচ্ছিরি চাকরি না। ছুটি বলতে কি কিছু আছে? আমেরিকান কোম্পানিদের এই ধারা। মাইনে দেবে দারুণ, অন্য সব কিছু দেবে, কিন্তু তোকে নিশ্বাস ফেলার সময় দেবে না। আর পান থেকে চুন খসলেই চাকরি যাবে। ওরা সব মার্সেনারি—অর্থনৈতিক ব্যাপারে।

সেটা অবশ্য ঠিকই। আমার অভিজ্ঞতা আছে।

তারপরই বলল, পরে কথা হবে। আগে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু অনিকেত রায়। অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আমার মেজমামার মেয়ে হিমিকা, যার কথা তুই শুনেছিস।

নমস্কার। দুহাত জড়ো করে বলল, হিমিকা।

অনিকেত বলল, নমস্কার।

ভাল লাগল অনিকেতের। মনে মনে ও আসলে এখনও বেশ প্রাচীনপন্থী আছে। মেয়েরা শাড়ি পড়লে ওর খুব ভাল লাগে। বাঙালির সঙ্গে কথোপকথনের সময়েও অকারণ ইংরেজি তো বটেই আমেরিকান কায়দা-কানুনও ওর আদৌ পছন্দ নয়। হিমিকা যে 'হাই' না বলে, 'নমস্কার' বলল তাতে সত্যিই ভাল লাগল ওর। নিজেদের এমন ঐতিহ্য, এমন সব সুন্দর সামাজিক ও ধার্মিক রীতিনীতি থাকতে কেন যে অনেকেই অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করে বোঝে না ও। যারা অগভীর তারাই সম্ভবত ও রকম করে। ইংরেজি জানতে হয়, বলতে হয়, লিখতে হয়। আজকাল কম্পিউটারের যুগে ইংরেজি না জানলে অবশ্যই চলে না। তবুও ই-মেইল-এ 'আই মিস ইউ' না লিখে Tomar janye mon kharap lage লেখাটাই অনেক উচিত বলে মনে হয় ওর।

চশমাটা খুলে ফেলতেই দুটি উজ্জ্বল, ফিঙের মতো কালো চোখ প্রকাশিত হল, কখনও কখনও কারও হৃদয় যেমন 'প্রকাশিত' হয় তেমন। অনিকেত ভাবল, পরে বলবে হিমিকাকে যে, যাকে ঈশ্বর এমন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন তার রোদ-চশমা পরা উচিত নয়। চোখই তো মনের জানালা। চোখে চেয়েই তো একজন মানুষের শিক্ষা, পটভূমি, বুদ্ধি, মানসিকতা সব কিছু বোঝা সবচেয়ে সহজ। ধোঁকা যে খেতে হয় না একেবারেই এমন নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছে যে চোখ মিথ্যা বলে না।

হিমি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল, ও আপনিই সেই গ্রেট অনিকেত রায়। আপনার বন্ধু তো আপনার মস্ত ভক্ত। আপনাকে না দেখেও আপনার সম্বন্ধে এত কিছু জানি যে আপনি জানলে বিস্ময়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

অনিকেত হেসে বলল, কী রকম?

আপনার একটা বিচ্ছিরি ডাকনাম আছে না? ভেটকু?

অনি হেসে ফেলল।

দাঁড়ান মশাই। এখনই কি? আপনি ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ব্লু ছিলেন? ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন ছিলেন? আপনি সুবিনয় রায়-এর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন, ভাল গান করেন, আপনার বাঁ পায়ের উরু এবং ডান বাহুতে চারটে করে লাল তিল

আছে।

অনিকেতের দুকান লাল হয়ে উঠল, কিন্তু জোরে হেসে উঠে তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, সত্যিই তকাই। তুই রিয়ালি ইনকরিজিবল।

তকাই বলল, চল হিমি, আমাদের সঙ্গে. আমরা ভালু-টোংড়ির মাথাতে সেই মস্ত বড় চ্যাটালো পাথরটাতে বসে থাকব হৃদি-ঝোড়ার পাশে। এক কলকাত্তাইয়াকে চাঁদ দেখাব। ওর গান শুনব। তুই গেলে তোরও। তোর খিদে পেয়েছে জানি কিন্তু তোর গর্ভধারিণী মা তাঁর খুকির জন্যে হটকেসে মাংসর সিঙাড়া ও মাছের কচুরি দিয়ে দিয়েছেন।

তাই?

বলল, হিমিকা।

কিন্তু ওসব খাবার পর যে চা বা কফি খেতে ইচ্ছে করবে।

তাও আছে।

হাউ থটফুল অফ হার।

ইয়েস। গরম কফি আছে ফ্লাস্কে। মিস্টার সাঁটুল শুধু ছোটমামার বডিগার্ডই নয়, সে তোর 'ভ্যালে'ও হবে।

বলছিস। তাহলে চল, যাওয়াই যাক। এখনও সময় আছে। ওখান থেকে তোর বন্ধুকে সূর্যাস্তটা দেখাতে পারবি। হৃদি-ঝোড়ার একটু দূরেই তো 'সানসেট পয়েন্ট'।

ঠিক তো। ভুলেই গেছিলাম।

তারপর বলল, তুই এ গাড়িতে আয়। ভার্সেটাইল সাঁটুল চন্দ্র তোর গাড়ি নিয়ে আসবে।

সবই ভাল কিন্তু সাঁটুল তো গিয়ার বদলায় না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো থার্ড আর ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালায় অথচ গিয়ারই হচ্ছে গাড়ির প্রাণ। এ কথা হাজারবার বলেও ওকে বোঝাতে পারিনি।

তকাই বলল, আয় ওঠ। ক্ষমা করে দে, ক্ষমা করে দে। আর কত কিছু জানবে বলত সাঁটুল? কোন ফসলে কোন সার দিতে হবে, পোকা লাগলে কোন ওষুধ দিতে হবে, ছোটমামার ড্রাইভিং লাইসেন্স কবে রিনিউ করতে হবে, বড়মামার ডেঞ্চার আনতে কবে কলকাতায় যেতে হবে ডেন্টিস্ট বারীন রায়ের কাছে ওয়াটারলু স্ট্রিটে, কবে ফাগুন বউ গাছে ফুল আসবে, এ বছর পুজোর কতদিন আগে থেকে হরশৃঙ্গার ফোটা শুরু হবে?

হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার?

হিমিকা বলল।

ফোর্ড আইকন-এর পেছনের দরজা খুলে হিমিকাকে গাড়িতে বসাতে বসাতে অনিকেতও বলল, হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার? হরধনু অবধি আমি জানি।

হিমিকা বলল, আমিও জানি না। হরশৃঙ্গার কোন গাছ? দেখতে কেমন?

রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখে নিল তকাই, সাঁটুল গাড়ি ঘোরাল কি না। তারপর গাড়ি ঘোরালো, ওকেই আগে আগে যেতে বলল। স্বগতোক্তি করল, ও তো প্রায়ই

যায়, ওকে ফলো করাটাই ভাল হবে।

তা ঠিক। তবে ধুলো খেতে হবে।

এসি চালিয়ে দিচ্ছি কাচ তুলে দিয়ে।

তকাই বলল।

ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক?

অনিকেত বলল।

সব পুষিয়ে দেব ওপরে পৌঁছে।

ঠিক আছে। কিন্তু হরশৃঙ্গার-রহস্যটা কী?

হরশৃঙ্গার মানে শিউলি। আমি জেনেছি ছোটমামার কাছ থেকে। ছোটমামাই একদিন বলেছিলেন। বিয়ের আগে...

ছোটমামার বিয়ে?

ভাগ্। প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীর বিয়ের আগে, মানে, কোর্টশিপ পিরিয়ডে, প্রমথ চৌধুরীর ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে পড়েছিলাম হরশৃঙ্গারের কথা। কী দারুণ লিখেছিলেন। ও রকম চিঠি লিখতে না পারলে কি ইন্দিরা দেবীর মতো রূপসী এবং সর্বগুণসম্পন্না কারওকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বধ করতে পারতেন। তাঁর নিজের অগ্রজকে সুপারসিড করে!

কী লিখেছিলেন চিঠিতে?

সেটা মনে করে রাখার মতো বলেই মনে করে রেখেছি। ছোটমামারও মুখস্থ ছিল। আসলে জানিস তো, আমার ছোটমামা এত বড় রবীন্দ্র-ভক্ত বলেই আমিও রবীন্দ্রনাথের এত বড় ভক্ত হয়েছি। আমি তো আমি, দেখলি তো সাঁটুলও হয়েছে। নইলে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকান টিউলিপ-এর নাম 'আকাশমণি' রেখেছিলেন এ কথা তো সাঁটুলের জানার কথা নয়?

হিমিকা বলল, শুধু ছোটমামাই কেন, বাবা, জেঠুমণি সকলেই রবীন্দ্র-ভক্ত। বলতে গেলে, ইট র‍্যান ইন দ্যা ব্লাড।

বল এবারে চিঠির কথাটা।

গাড়িটা গিয়ারে দিয়ে এসি-টা চালিয়ে তকাই বলল, বলছি। সঠিক মনে নেই, থাকার কথাও নয়। লিখেছিলেন ঃ ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যে রকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবে একটুখানি চাঁদের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, একটি গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিতা, মহত্ত্ব, বলে জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না। বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে তা একটি ফুলের গন্ধ যেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা দশ ভল্যুম ফিলজফিতেও পারে না।

যে-ফুলের গন্ধর উল্লেখ উনি করেছেন এখানে তাই হরশৃঙ্গার বা আমাদের

চিরচেনা শিউলি।

তকাই বলল, তুই এতখানি মুখস্থ করে রেখেছিস?

ইচ্ছে করে করিনি। বহুজনকে বহুবার বলতে বলতে নিজের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছে।

হিমিকা বলল, আমাদের জেঠুমণি ও ছোটকাকুর তো পুরো গীতা এবং চণ্ডীও মুখস্থ আছে। বাবারও ছিল। মুখস্থ করবেন বলে তো মুখস্থ করেনি। বাবা বলতেন, দাদুর আদেশানুসারে ঘুম থেকে উঠে যোগাসনে বসে কোনওদিন পুরো গীতা এবং কোনওদিন পুরো চণ্ডী পাঠ করতে হত। করতে করতে পুরোটাই নিজেদের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছিল। কেন? মুসলমানেরা কোরাণ মুখস্থ করে না?

যাকগে যাক। এ সব কথা আর কারোকেই বলিস না। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা জানতে পেলে তোকে বর্বর বলবে। গীতা বা চণ্ডী পড়লে পাপ হয়। ও সব "গৈরিকীকরণের" হাতিয়ার। এখন শুধু মার্কস আর কোরাণই পড়া চলতে পারে। হয়ত বাইবেলও।

তকাই বলল।

ভেটকু বলল, সত্যি! যে সংস্কৃত ভাষাকে ভর করে আমাদের তাবৎ ধর্ম-কর্ম, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ সেই ভাষাই এখন বাঙালিদের কাছে ব্রাত্য হয়ে উঠেছে। এমন ঘোর দুর্বুদ্ধিজীবী, সুযোগ-সন্ধানী এবং আত্মবিস্মৃত জাতি ভারতবর্ষে আর বোধহয় একটিও নেই। ভাবলেও লজ্জা করে!

অনিকেত বলল, এতদিনে বুঝলাম তকাই-এর পুরো ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, পুরো কোম্পানি অ্যাক্ট কী করে মুখস্থ হয়েছিল। সাব-সেকশন মায় সব প্রোভাইসো শুদ্ধু মুখস্থ বলতে পারত তকাই ওর সি এ পরীক্ষার আগে, বালিগঞ্জ লেক-এর বেঞ্চিতে বসে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। এখন বুঝতে পারছি যে, রবীন্দ্র-ভক্তিরই মতো মুখস্থ করার শক্তিও also ran in the blood।

তকাই বলল, কথা না বলে দু'দিকে দ্যাখ। পথটা কেমন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। দু'পাশে পর্ণমোচী বন। আহা! আমি Fall-এর সময় কানাডাতে থেকেছি...

আমিও থেকেছি। স্টেটস-এ ইয়ালোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক-এ গেছি ঐ সময়ে।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, আমি ইয়োরোপের Fall দেখেছি। বহুবর্ণ পাতার সে কী রূপ।

হিমিকা বলল, আমাদের হেমন্তকালকেই ত পশ্চিমী দেশে Fall বলে। ও সব দেশে আমাদের মতো এমন ছয় ঋতুতো নেই।

অনিকেত বলল, আঃ! তখন ওসব দেশে পাতার কী রং হয়। কর্বুর।

হিমিকা বলল, কর্বুর মানে?

কর্বুর মানে, বহুবর্ণ। তকাই বলল।

তাই?

সত্যি। তুই কত যে জানিস তকুদা।

তকুদা, এবারে যা বলছিলি তা বল। সেনটেন্সটা শেষ কর।

হ্যাঁ। বলছিলাম, দু'পাশে পর্ণমোচী বন এবং এই বসন্তে আমাদের ভারতবর্ষের বন, পাহাড়, প্রকৃতি যেমন সুন্দর তেমন সুন্দর সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও জায়গার জঙ্গলই নয়। আর যেহেতু আমাদের সব গাছ-গাছালি পাতা পশ্চিমী দেশের মতো একই সময়ে ঝরে না, পাতা, কিছু গাছের ঝরলেও অনেক গাছেই তখনও পাতা থাকে। গ্রীষ্মে কিছু গাছের পাতা ঝরে আর কিছু গাছের ঝরে শীতে।

তাই? বলল হিমি।

তারপর বলল, মারুতিকে তো দেখাই যাচ্ছে না রে তকুদা। সাঁটুল কি পাহাড়ের ঘাটরাস্তাতেও 'টিকিয়া উড়ান' চালাচ্ছে?

তাই তো মনে হচ্ছে। ছোটমামার বডি-গার্ড তো।

তাড়াতাড়ি চালা তকুদা। সূর্য ডুবে গেলে তোর বন্ধুর সান-সেট পয়েন্টে গিয়ে সান-সেট আর দেখা হবে না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভালু-টোংড়ির ওপরে গিয়ে পৌঁছল গাড়ি। পাহাড়টা তো খুব উঁচু নয়। খুব উঁচু হলে তার নাম টোংড়ি হত না। ওপরে উঠে বোঝা গেল জায়গাটা মালভূমির মতো। তবে অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা। দূরে মাঠমতো জায়গাটার অন্য প্রান্তে হিমিকার সাদা মারুতিটা দেখা গেল।

হিমিকা বলল, ঐ দেখো! দেখেছ, টাঁড়-এর শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে গাড়ি। আমরা কি ফুটবল খেলতে এসেছি এখানে। আশ্চর্য।

তকাই সেখানে নিয়ে গেল তার গাড়িও। গাড়ি থেকে সকলে নেমে একটা মস্ত গাছের নীচে একটি পাথরে বসল। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে দিগন্তরেখা থেকে হাতখানেক ওপরে আছে। প্রকাণ্ড একটা লাল থালার মতো।

অনিকেত বলল, এই তাহলে সান-সেট পয়েন্ট।

সাঁটুল বলল, এ জন্যেই গাড়ি এখান অবধি এনেছে, যাতে সময় নষ্ট না করে আমরা তাড়াতাড়ি স্পট-এ পৌঁছই।

তকাই অনিকেতের কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, ভেটকু।

বলেই, পুবে তাকাতে বলল।

অনিকেত তাকালে, বলল ও, আজ তো পূর্ণিমা নয়। একটু পরে উঠবে চাঁদ আজ। এখনই দেখা যাবে না।

সাঁটুল বলল, দিদি, সূর্য ডোবা দেখে এখানে বসেই কি খাবে তুমি? কাগজের প্লেট, ন্যাপকিন, হট-কেস সব বের করব?

তকাই বলল, দাঁড়া না সাঁটুল। সান-সেট দেখে সবাই গিয়ে আমরা হৃদি-ঝোড়ার কাছে সেই বড় পাথরটার ওপরেই বসব। আমাদেরও তো সেবা-টেবা করবি তুই নাকি? গ্লাস এনেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সবই গুছিয়ে এনেছি। ঘি-এ ভাজা মাঠ্‌রীও এনেছি—রাম্-এর সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।

সাঁটুলের খিদমতগারিতে কোনও ফাঁক থাকে না।

হিমি বলল।

তারপর তকাইকে বলল, তাই ভাল।

অনিকেত বলল, সত্যিই দারুণ।

অনেকটা পালামৌর নেতারহাটের সান-সেট দেখার জায়গা, 'ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টের' মতো এই জায়গাটা।

তারপর বলল, একটা ক্যামেরা আনলে ছবি তোলা যেত।

সান-সেটের ছবি?

হিমি বলল।

হ্যাঁ।

সান-সেটের ছবি তা সমুদ্রেই হোক কি পাহাড়ে, এখন 'ক্লিশে' হয়ে গেছে।

তা অবশ্য ঠিক।

আমাদের সকলের তবু ছবি তুলতাম। থেকে যেত।

আমরা কেউ কি পটল তুলেছি? সকলেই যখন বেঁচে আছি এবং আরও বহুদিন বহাল তবিয়তে থাকব তখন ছবির দরকার কী?

তকাই বলল, মামিমা কিন্তু আমাকে বারবার করে আসতে বলছেন দোলে। আসবি নাকি? উইক এন্ডে একটা দিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই হয়ে যাবে।

তোর আবার ছুটি কি? নিজের ফার্ম। নিজেই তো নিজের মালিক।

আর সেই জন্যেই তো অসুবিধা। নিজের মালিক হলেই ছুটি নেওয়াটা সবচেয়ে অসুবিধের।

দ্যাখ চেষ্টা করে। হিমি তুই থাকবি তো দোল অবধি?

থাকব বলেই তো বলছি। তোরা এলে খুব মজা হবে। একদিন দুর্গা পাহাড়ে যাব, আরেকদিন মহাদেব-ঝুঁটিতে। পিকনিক করব।

অনিকেত একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন তো সূর্যকে ডোবাই আগে, তারপর ভাবা যাবে।

তোর গান শোনাতে হবে কিন্তু হিমিকে।

ভাগ।

ভাগ মানে?

অমি তো বাথরুম সিঙ্গার।

হলে কী হয়। ইউনিভার্সিটিতে কত মেয়ে ওর গান শুনে প্রেমে পড়েছিল, জানিস হিমি।

বেচ্চারিরা! সব ব্যর্থ প্রেমিকা।

বলল, হিমি।

অনিকেত দিনের শেষ আলোতে তাকাল হিমির দিকে। কাটা-কাটা নাক-চিবুক। ঠোঁট দুটি ভীষণই ব্যক্তিত্বময়। গায়ের রং বেশ কালোই। মাথাতে চুল খুব বেশি নেই। পনি টেইল করে বাঁধা শাড়ির রঙ মেলানো একটি হালকা বেগুনি রিবন দিয়ে। আজ অবধি যত মেয়ে দেখেছে অনিকেত, হিমি তাদের কারও মতোই নয়। সুন্দরী বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাও নয়। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুই অনিকেতের চোখে

হিমিকে বিশিষ্ট করে তুলল। গলার স্বরটি গাঢ়। যখন কথা বলে তখন থতড়ন-এ কথা বলে কিন্তু অনেক নারী-পুরুষেরই স্বরের মতো তা ইচ্ছাকৃত নয় আদৌ। গলার স্বরটিকে গাঢ় বললে ঠিক বলা হয় না। ভরা কলসের মতো।

অনিকেত বলল, আপনি গান গান না?

গা-ই-তা-ম। বিয়ের জন্যে এক সময়ে সব বাঙালি মেয়েদেরই অন্তত গোটা ছয়েক গান তো শিখতেই হত। সেই সময়ে মা জোর করে শিখিয়েছিলেন। বিয়ে তো হল না, গানগুলো রয়ে গেছে। ওই ছটা গানের যে কোনওটি আপনাকে শোনাতে পারি কিন্তু তকুদা আর সাঁটুল এতবার শুনেছে ওর সবকটিই যে ওরা ভীষণই আপত্তি করতে পারে।

তকাই বলল, নারে ভেটকু। ইয়ার্কি। ও রীতিমতো ক্লাসিক্যাল শিখেছে এক সময়ে। বড়মামিমা খুব ভাল গাইতেন। বলতেন, এমনিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তর, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নজরুলের অনেক গানই বেশি গায় মানুষে কিন্তু ক্লাসিক্যাল যদি ছেলেবেলাতে না শেখা যায় তবে ভালভাবে গান গাওয়া যায় না।

থামত তকুদা তুই।

হিমি বলল। তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আপনি কোথায় শিখেছিলেন? সুবিনয় রায়-এর কাছে তো শুনলাম, আর কোথায়?

'গীতবিতান' থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম।

বাবা। তাহলে তো পাকা গাইয়ে একেবারে।

'গীতবিতান' বা 'দক্ষিণী' থেকে ডিপ্লোমা নিলেই বুঝি সবাই পাকা গাইয়ে হয়ে যান? তাহলে তো কথাই ছিল না।

থাক তো এ সব তাত্ত্বিক আলোচনা।

এবারে আমি একটা কথা বলি?

তকাই বলল।

কী কথা?

এবারে আধঘণ্টা আমরা সবাই চুপ করে থাকি। শহুরেরা এক হলেই একই কথা আলোচনা করে। এবার শোন ভেটকু এই শুক্লপক্ষের রাতে ভালু-টোংড়ির কী বলার আছে। আধঘণ্টার মধ্যে চাঁদও উঠে আসবে হামাগুড়ি দিয়ে গাছ-গাছালির মাথায়। তারপরে হিমি চা খাবে, আমরা অন্য কিছু। তারপরে গান শোনা যাবে হিমি এবং তোরও। এখন অ্যাবসল্যুট সাইলেন্স।

ওর কথা বন্ধ করতেই বন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। পাগলের মতো একটা পিউ কাঁহা পাখি, যার ইংরেজি নাম ব্রেইন-ফিভার, সত্যিই যেন মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড জোরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপরে দিয়ে। তারপরই হুদি-ঝোড়া নামক জলপ্রপাতের মৃদু মর্মর স্পষ্ট হল। হাওয়াটা বনময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল মিশ্র বনগন্ধ নিয়ে। অনিকেতের যেন ঘোর লাগল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ও আধো অন্ধকারে। তকাই-এর এবং হিমির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। যাচ্ছিল না বলেই এক আশ্চর্য রহস্য যেন ঘিরে ছিল তাদের।

সাঁটুল পেছনে একটা নিচু পাথরে বসেছিল তাই তাকে দেখা যাচ্ছিল না। অনিকেতের মনে হচ্ছিল তকাই-এর অত চেনা মুখটিও যেন অচেনা হয়ে গেছে সেই রহস্যময় অন্ধকারে আর হিমির অচেনা মুখটি তার কল্পনাতে ধীরে ধীরে চেনা হয়ে উঠতে লাগল।

হৃদি প্রপাতের নীচের দিক থেকে একটা চিতল হরিণ টাউ টাউ টাউ করে ডেকে উঠল। বনের রহস্য তাতে আরও নিবিড় হল। দুটো পেঁচা কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর শব্দ করে ওদের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে লাগল। একটা পাখি, ওরা যে সান-সেট পয়েন্টে বসেছিল তার সামনের খোলা প্রান্তরের বুকের মধ্যে চমক তুলে তুলে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দিয়ে ডাকতে লাগল ডিড-উ-ড্যু-ইট, ডিড-উ-ড্যু-ইট। পাথরটার নীচে শুকনো পাতার মধ্যে সরসর শব্দ করে কী একটা সরীসৃপ ধীরে ধীরে চলে গেল। অস্বস্তিতে অনিকেত ওর পা টা তুলে বসল। তকাই দেখল, কিন্তু কথা বলল না কোনও। ভালু-টোংড়ির নীচের কোনও গ্রাম থেকে মাদল আর ধামসার সঙ্গে আদিবাসীরা গান ধরল। আশ্চর্য সে গান। নারী-পুরুষের সেই সম্মিলিত গানের দোলানি সুরে, ঘুম পেতে লাগল অনিকেতের-মনে হল, এ যেন কোনও ঘুমপাড়ানি গান, শিশুকালে মা তাকে কোলে করে যে রকম গান গাইতেন নিচু গ্রামে, তেমন। গান তারা জোরেই গাইছিল কিন্তু অনেক দূরে থাকায় ওদের কাছে তা নিচু গ্রামে এসে পৌঁছচ্ছিল।

তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সেই মালভূমি। গন্ধবাহী হাওয়াটাও যেন কার অদৃশ্য আঙুলের সঙ্কেতে থেমে গেল! কিছুক্ষণ পরে আবার দুলে উঠল হাওয়াটা। শুকনো পাতা গড়িয়ে উড়িয়ে। আবার ফিসফিসানি শুরু হল। এমন সময়ে এক জোড়া কী যেন বড় জানোয়ার সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের দিকেই ঘুরে এগিয়ে আস্তে লাগল। কী জানোয়ার, কে জানে! প্রায়ান্ধকারে আকাশের পটভূমিতে তাদের কালো শরীরের শিল্যুট ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

তকাই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সাঁটুলকে চাপা গলায় কী যেন বলল। সাঁটুল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে সামনে একটু এগিয়ে গেল। পরক্ষণেই কোমরের বেল্টে বাঁধা রিভলবারটা বের করে পরপর দুটো গুলি করল। জানোয়ার দুটোর সামনে হাত দশেক আগে মাটিতে গুলি দুটো গিয়ে পড়তেই ওরা মুখ ঘুরিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক লাফিয়ে চলে গেল বাঁদিকে। তারা মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে পৌঁছতেই তাদের নীচে নেমে যাবার শব্দ জঙ্গলের শুকনো পাতা এবং ঝোপেঝাড়ে স্পষ্ট শোনা গেল। তাদের চলে যাওয়াটা তারা গোপন রাখল না। যদিও আসাটা রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের শব্দ একেবারে থেমে গেল। থেমে যাওয়ার পরে সাঁটুল বলল, ভাগ্যিস তোমরা চুপ করে ছিলে। নইলে বাবাজীদের আসাটা তো আমরা লক্ষই করতাম না। রিয়্যাল কেলো হয়ে যেত।

অনিকেত একটু ভয়ও যে পায়নি এমনও নয়। এতক্ষণে ও কথা বলল। বলল, কী ও দুটো?

ভাল্লুক! আবার কী? তাদেরই তো জমিদারী এটা। আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে হাজির হয়েছি, আমরা কারা, কী মতলবে এসেছি তাই খোঁজ করতে আসছিল আর কী। ভাগ্যিস গুলির শব্দ শুনেই তারা চলে গেল।

উল্টোটাও তো ঘটতে পারত।

ওরা তেড়ে এলে খুবই মুশকিল ছিল। সাঁটুল বলল, রিভলবার দিয়ে যত সহজে মানুষ মারা যায় অত সহজে অত বড় ভালুকদের ক্ষতি করা যেত না। তাছাড়া তাদের গায়ে গুলি লাগলে অন্য ফ্যাসাদেও পড়তে হত। বনবিভাগ কেস করত। তার ওপরে তারাই হয়ত আমাদের ফেড়ে দিয়ে যেত একেবারে। ভাল্লুকের মতো খারাপ জানোয়ার আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে আর দুটি নেই। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে, বিনা প্ররোচনাতেও তারা মানুষের নাক চোখ ঠোঁট খুবলে নিতে খুব ভালবাসে। মাংস খায় না, অথচ কেন যে অমন করে কলকাতার কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতো, কে জানে! গত জন্মে সব ভাল মানুষদের সঙ্গেই বোধহয় ওদের বিশেষ কোনও শত্রুতা ছিল।

তাহলে খুবই বেঁচে গেছি আজকে আমরা। কী বল সবাই।

দোষ তো তোমারই সাঁটুল। দ্যাখো, ওটা কী গাছ।

তকাই বলল।

তাই তো। এখানে বসাটাই ভুল হয়েছিল আমাদের।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, কেন?

ওটা মহুয়া গাছ। ফলে ভরে আছে এখন। গন্ধ পাচ্ছিস না? তীব্র মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার ঝলকে ঝলকে? মহুয়াই খেতে আসছিল ওরা।

আবারও যদি আসে?

অনিকেত বলল, ভয়ার্ত গলায়।

আপাতত আর আসবে না। পরে হয়তো আসবে।

বাবাঃ। সত্যিই খুব বেঁচে গেলাম আমরা আজকে। কী দরকার ছিল এখানে রাতের বেলাতে আসার?

অনিকেত রিয়াল কলকাত্তাইয়ার মতোই বলল।

তকাই বলল, ভয় আছে বলেই তো ভালু-টোংড়ির সৌন্দর্য দশগুণ বেড়ে গেল। ভালবাসার মধ্যে অনিশ্চিতি এবং ভয়ই যদি মিশে না থাকে তবে সেই ভাললাগা ভালবাসা বড়ই আনইন্টারেস্টিং।

অনিকেত বলল, কী জানি বাবা!

তকাই বলল, হিমিও বেঁচে গেলি খুব। ভাল্লুকেরা, হনুমানদেরই মতো, মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করে।

তার মানে?

মানে, ভাল্লুকে মেয়েদের রেপও করে। অ্যানাটমিকালি অসুবিধের নয়, তাই। তাই বনেজঙ্গলে ফল-কুড়োনো কাঠ-কুড়োনো মেয়েরা বাঘের চেয়ে ভাল্লুককেই বেশি

ভয় করে।

হিমি হেসে বলল, যত আজগুবি গল্প তোর তকুদা। তাছাড়া ওরা তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেসই ছিল।

আরে পুরুষ জাতটাই ছিঁচকে চোর। স্ত্রীর সামনে সবাই মহৎ, সবাই সৎ, সচ্চরিত্র। একা থাকলে তবেই না তাদের চরিত্র দাঁত বের করার সাহস পায়। তকাই বলল।

তারপর বলল, সত্যি বলছি রে। বিশ্বাস না হয় তো জিজ্ঞেস কর সাঁটুলকে।

সাঁটুল বলল, সে রকম হয় না যে তা নয়। তবে আমার অভিজ্ঞতায় জানি না। বাবার কাছে অমন একটা কথা শুনেছিলাম বটে। অবশ্য ছেলেবেলায়।

তকাই বলল, আচ্ছা মিস্টার সাঁটুল। এক সন্ধের পক্ষে আমার বন্ধুর অনেকই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোর মাধ্যমে নানা গাছ-গাছালি চেনা, হিমিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সান-সেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখা এবং তারও পরে ভাল্লুক-দম্পতি দর্শন, এবারে হিমির কফি ও 'টা' এবং আমাদের রাম্ পান করাও মাঠ্রী সহযোগে তা না হলে ছোটমামাকে নালিশ করে দেব আমাদের মোটেই দেখাশোনা করিসনি বলে।

ঠিক আছে। দিচ্ছি। বলেই, সাঁটুল গাড়ির বুট খুলে খাদ্য-পানীয় সব বের করতে গেল।

তকাই বলল, মিস্টার ভেটকু, ওপরে চেয়ে দ্যাখ, মিস মুন তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন চার চোখের মিলনের জন্যে।

সকলেই ওপরে তাকাল একই সঙ্গে।

হিমি হেসে উঠল তকাইয়ের কথা বলার ধরনে।

দেখেছিস? এ রকম চাঁদ কখনও কলকাতাতে দেখেছিস? না দেখবি? শিরিষ গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে মুখ দেখাচ্ছে আর উল্টোদিকে মুখ করে দ্যাখ, পশ্চিমাকাশে নীল, স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারাটা কেমন নিঃশব্দে উঠে তার দ্যুতিতে বিশ্ব চরাচরকে শান্তিতে ভরে দিয়েছে।

বাবাঃ। তুই তো দারুণ বাংলা বলছিস রে তকুদা। আজকাল।

ভুলে গেলি এরই মধ্যে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাতে বাংলাতে আমি সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিলাম।

ভোলা কি কখনও সম্ভব? বাবা-কাকারা, মা ও কাকিমারা তো উঠতে বসতে সে জন্যেই কথা শোনাতেন। বলতেন, লজ্জা করে না? তকুকে দ্যাখ। তুই খোট্টা হয়েই থাক। তোর আর বাংলা পড়ে দরকার নেই।

মেজমামা বেঁচে থাকলে জানতেন যে, আজকে সচ্ছল বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাংলা আর হিব্রুর মধ্যে তফাত জানে না আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদান্যতায় বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েরাও যা বাংলা শিখছে তা আর বলার নয়।

কেন এমন হচ্ছে?

মাস্টারমশাইরা নিজেরা তেমন জানলে তো শেখাবেন! স্কুল মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক সবের নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক প্রভাব এতখানিই পড়ে আজকাল

যে তা বলার নয়। লেখাপড়া করে কী হবে। রাজনীতি করলেই হবে।

এটা তোর একটু বাড়াবাড়ি হল।

অনিকেত বলল।

হলে হল। আমার যা মনে হয় তাই তো আমি বলব।

তারপরই বলল, মাঝে মাঝেই আমার কী মনে হয় জানিস ভেটকু?

কী?

মনে হয়, কলকাতার কাজ সত্যিই বন্ধ করে এখানে চলে আসি। মামাদের বহুদিনের ইচ্ছে। ওঁদেরও তো বয়স হচ্ছে। নানা Trust ওঁরা কবে গেছেন কিন্তু তবু নিজেরা ভালবেসে না দেখাশোনা করলে কি হাসপাতাল, স্কুল এসব চলে। এখানে আমার কত কীই না করার ছিল। সত্যিকারের দেশের কাজ, দশের কাজ। মামারা আমার ওপরে কোনওদিনই তেমন জোর করতে পারেননি কারণ নিজেদের ছেলেমেয়েরাই তো কথাটা বুঝল না। হিমিও তো চাকরি করতে চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। মনে ওঁদের সকলেরই খুব দুঃখ এবং অভিমান। মুখে প্রকাশ করেন না। একমাত্র ছোটমামা মাঝেমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেন।

বলেই বলল, আসবি এখানে ভেটকু? ছোটমামা আমাকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু এলে আমি প্রথমে মোটর ড্রাইভিং-এর স্কুল দিয়েই আরম্ভ করব। কলকাত্তার ড্রাইভারদের মাইনে কত জানিস? তিন-চার হাজার। পার্কস নিয়ে অনেকে দশ হাজারেরও ওপরে পায়। অথচ তিন-চার হাজার মাইনেতে মাড়োয়ারি গুজরাটিদের ফার্মে গলায় টাই ঝুলিয়ে হাতে ব্রিফকেস নিয়ে কত বাঙালি ছেলে চাকরি করে সেলসম্যানের। ওই টাইগুলো দেখলে আমার ইচ্ছে করে ওদের বলতে, গলায় দড়ি দিয়ে মরো না কেন বাছারা?

বাঙালি ড্রাইভার প্রায় কেউই রাখে না। বাঙালিরাও রাখে না। সব বিহারী, নয় ওড়িয়া, নয় উত্তরপ্রদেশীয়।

কেন? রাখে না কেন?

কামাই করে, সময়ে আসে না, নানা অজুহাত, বাহানা। মানুষেরা টাকা বেশি দিতেও কার্পণ্য করেন না যদি ঠিক মতো কাজ পান। তার ওপরে বাড়তি গুণ ইউনিয়নবাজি। এই ইউনিয়নবাজি, স্ট্রাইক, ঘেরাও, চোখ রাঙানি, পথ অবরোধ, রেল রোকো এ সব যে কবে বন্ধ হবে? অগণ্য কাজের মানুষের সব রকম অসুবিধা করে মিছিল, পথ-সভা এসব পশ্চিমবাংলার যা ক্ষতি করেছে তা বলার নয়। জানি না, কাদের ইমপ্রেস করার জন্যে এসব করা হয়। মানুষ কি গরু-গাধা? খেটে খাওয়া মানুষের কি বুদ্ধি নেই? তারা কাজ করতে চায়, কাজ চায়, চাকরি চায়, নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে চায়, তারা নানা নেতার মেদিনী কাঁপানো বক্তৃতা শুনতে চায় না। তারা চায়, ট্রাম-বাস-রেল ঠিক মতো চলুক, পথে ট্র্যাফিক জ্যাম না হোক। সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সকলেই জেগে গেছে এবং প্রকাশ্যেই বলে, বাঙালি কাজও করে না, উল্টে ইউনিয়নবাজি করে। কার দরকার পড়েছে বাঙালিকে চাকরি দেবে? "ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই"-এর স্বাভাবিক নিয়মে যে চাকরি বাঙালিরই পাওয়ার

কথা সেই চাকরি বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের মানুষ পেয়ে যাচ্ছে।

হিমি বলল, খাবার আর কফি খেতে খেতে, যাঃ বাবা। তোমরা কি এই সব আলোচনা করতেই আর ভাল্লুকের কামড় খেতে এই ভালু-টোংড়িতে চড়েছিলে। এমন পাগলের মতো করলে তো তোর স্ট্রোক হয়ে যাবে তকুদা। নিজেকে শান্ত কর।

কী করব। আমার রাজ্যকে, আমার দেশকে আমি ভালবাসি বলেই তো চুপ করে থাকতে পারি না।

সাঁটুল গ্লাস নিয়ে আর প্লেটে মাঠ্রী নিয়ে তকাইকে বলল তকুদা, এই যে ধরুন।

তকাই রীতিমতো ওয়ার্কড-আপ হয়ে গেছিল। রাম্-এর গ্লাসটা হাতে ধরেই চুপ করে গেল। বলল, ওরে, অতিথিকে আগে দে। তুই কী রে সাঁটুল!

দিয়েছি তো।

তকাই বলল, সরি। আমাকে তোরা ক্ষমা করে দিস।

কী যে বলিস তুই তকুদা।

হিমি বলল।

অনিকেত বলল, বক্তৃতা না দিয়ে এখানেই চলে আয় বরং। করে দেখা। তুই যে, পারিস, করে দেখা। তা দেখাতে পারলেই করার মতো কিছু করা হবে। মতলববাজ রাজনীতিকদের গালে থাপ্পড় মারা হবে।

কারও গালেই থাপ্পড় মারতে আমি চাই না। আমি চাই নিজের রাজ্যকে বাঁচাতে। শুধুমাত্রই নিজের পকেট ভরার জন্যে নিজের নাম-যশ-প্রাইজের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই না।

তাই তো বলছি। চলে আয়। আর তুই যদি আসিস তাহলে কথা দিচ্ছি, আমিও আসব।

হিমি খাওয়া থামিয়ে বলল, তকুদা, তোরা যদি আসিস, তুই তো আসতেই পারিস, তোর মামাবাড়ি, কিন্তু অনিকেতবাবু যদি আসেন বাইরের মানুষ হয়ে, তবে আমিও আসব। আসব মানে, এও বলতে পারি যে, ব্যাঙ্গালোরে আর ফিরেই যাব না।

তকাই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে।

তারপরই বলল, সাঁটুল, ফেরার সময়ে আমাদের কিচলির মোড়ে নামিয়ে দিবি।

কেন? তকুদাদা?

সাঁটুল বলল।

না, তুই আগে গাড়ি নিয়ে গিয়ে বড়মামা, মেজমামিমা আর ছোটমামাকে খবরটা দিবি। বুড়ো-বুড়িরা আনন্দেই না আজ রাতে স্ট্রোক হয়ে মারাই যায়। তাঁদের কত দিনের স্বপ্ন, আমাকে যে কতবার বলেছেন!

হিমি বলল, আমাকেও। কতবার যে সকলে কতভাবে বলেছেন। অনুনয়-বিনয় বললেও কম বলা হয়। তবে যাওয়ার সময়ে ডঃ মাহাতোকে তুলে নিয়ে যাস। সঙ্গে যেন তাঁর ব্যাগটা নিয়ে যান। আমি ঠাট্টা করছি না। আনন্দের shock-টা দুঃখের shock-এর চেয়ে একটুও কম নয়।

সাঁটুল মুখ ব্যাজার করে বলল, এ তো আর সাইকেল নয় যে একটা নিজে চালালাম আর অন্যটাকে পাশে পাশে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম! এ যে গাড়ি! একটা গাড়ি তো তোমাদেরও চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঠিকই তো। তবে এই এখান থেকে আধঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে যা।

তা হবে না। তোমাদের কারও কাছেই কোনও যন্ত্র নেই। ভাল্লুক দুটো যদি আবার আসে। তার চেয়ে চলো — নেমে তোমরা কিচলির মোড়ে গাড়িতে বসে বা পায়চারি করতে করতে চাঁদের আলোয় জঙ্গল দেখ। নীচে কোনও খতরনাক জানোয়ার নেই। শেয়াল, খরগোশ এসবই আছে। আমি না হয় আগেই চলে যাব।

রাতে কী রান্না হচ্ছে জানিস?

ঠিক জানি না, তবে মা বলছিলেন লুচি আর কচি পাঁঠার মাংস হবে। ফুদিয়ার দোকান থেকে পাঁচুকে দিয়ে রাবড়িও আনিয়ে রেখেছেন ফ্রিজ-এ। আর কাঁচা আমের চাটনি।

তকাই বলল, গিয়ে স্টপ করা। আমার বন্ধু ভেটকু ভুনি খিচুড়ি খেতে খুব ভালবাসে। মেজমামিকে বলবি, তাঁদের বাপের বাড়িতে হাজারিবাগে যেমন ভাজা মুগের ভুনি খিচুড়ি হয় তেমন ভুনি খিচুড়ি করতে আর সঙ্গে কষা মাংস। আজ ভেটকুকে মামাবাড়ি ও আমার তরফেও একটা Treat দেব—নরাণাং মাতুলক্রমঃ বলে কথা।

বলেই বলল, আচ্ছা হিমি, তোর সঙ্গে না ছোটমামার কী জরুরি কথা ছিল বলে উনি এলেন না আর তুই না বলে কয়ে এখানে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলি। বুড়ো মানুষের চিন্তা হবে না? তুই তো ভারি ইরেসপনসিবল।

ভেব না যে আমি অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ছোটকাকার কাছে তোমরা ভালু-টোংড়িতে আসছ জানতে পেরে আমি গাড়ি থেকেই মোবাইলে কথা বলে নিয়েছিলাম।

তাই? হাউ থটফুল অফ ইউ। তা তোর সঙ্গে মোবাইল আছে তো, মামিমাকে তো মোবাইলেই বলে দেওয়া যায় লুচি-ফুচি করে ফেলার আগে।

মোবাইল তো আমার কাছেও আছে। ছোটবাবু দিয়েছিলেন।

সাঁটুল বলল।

আছে? এতক্ষণ বলিসনি কেন? ইডিয়ট।

তোমরা মোবাইল ফোন আনোনি তকুদা?

হিমি জিজ্ঞেস করল তকাইকে।

না, আমরা কেউই আনিনি। কলকাতাতেই রেখে এসেছি। ইনফরমেশন টেকনোলজির এমন বাড়াবাড়িটা আমাদের দুজনের কারওই পছন্দ নয়। আমরা এখন ডিস-ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোমোট করব।

হিমি বলল, তুইই বল না মাকে তকুদা। মা খুশি হবে। আর shock absorb-ও করতে পারবে। আমাদের দেশের মেয়েদের মতো shock absorber-তো ঈশ্বর আর তৈরি করেননি।

তবে দে ফোনটা।

তকাই বলল।

সাঁটুল, আমার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে আছে। নিয়ে এসো তো।

তকাই বলল চল, আমি যাচ্ছি। এত বড় একটা ইম্পট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট — একটু নির্জনে দাঁড়িয়ে ক্যারি-আউট করাই ভাল।

বলেই, সেই মাঠ বা টাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, কী রে অনি। মেনু যা বললাম, তাতে হবে তো?

একটা আইটেম add করতে হবে?

কী সেটা?

কুড়মুড়ে আলু ভাজা।

বাঃ দারুণ। আর মামাবাড়ির বুধিয়া গাই-এর গাওয়া ঘিও থাকবে। শুকনো লঙ্কা ভেজে দিতে বলব তো গরম গরম খাওয়ার সময়ে?

আলবাৎ। আমি রেড রাম্ সত্যিই খাই না। ছোটমামা ভালবেসে পাঠিয়েছেন। রাম্-এর মুখে ভুনি খিচুড়ি যা জমবে না।

তুই তো মেজমামির হাজারিবাগী ভুনি খিচুড়ি খাসনি। খেলে, অক্কা যাবি।

তকাই ফোন করার জন্যে সাঁটুলের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে গাছেদের ছায়ার বুটি-কাটা গালচের ওপর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর পেছন পেছন রাম্-এর গ্লাস ধরে সাঁটুলও গেল।

ভেটকু মনে মনে বলল, তকাই একটা রিয়াল বুর্জোয়া।

ঠিক সেই সময়েই পিউ কাঁহা পাখিটা কোথা থেকে ফিরে এসে আবার সমানে ডাকতে লাগল। সেই ডাকের তীব্র শিহরন তোলা অনুরণন উঠল পাহাড়ে খাদে, প্রান্তরে এবং ঝরনাতলাতে। তার প্রিয়াকে খোঁজা এখনও শেষ হয়নি বোধহয় পাখিটার। অনিকেত ভাবছিল যে, তার প্রিয়া তো এখনও কেউই হয়নি। খোঁজা শুরু করতে হবে।

হিমি বলল, কী ভাবছেন? আপনার সর্বনাশ হল আমার সঙ্গে দেখা হয়ে?

না, তা নয়। তাছাড়া কী সর্বনাশ আর কী পৌষমাস তা কি আমরা নিজেরাই জানি।

তারপর বলল, আপনি 'চার অধ্যায়' পড়েছেন? রবীন্দ্রনাথের?

পড়ব না?

তাহলে তো পড়েইছেন, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

সত্যি। রবীন্দ্রনাথ কী মডার্ন। কোনওদিনও পুরনো হবার নয়। কিন্তু আপনি কী ভাবছিলেন তা তো বললেন না?

না, ভাবছিলাম, একজন মানুষের জীবনে কত কীই ঘটে যায় এক নিমেষে। এমন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে খুব ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষও এক নিমেষে যে,

নিজেই অবাক হয়ে যায়। কলকাতা ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটা তো সহজ নয়। তকাই আমাকে বলেছে আগে অনেকবার। ভেবে দেখতে বলেছে। অথচ আশ্চর্য। কোনও ভাবাভাবি ছাড়াই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কী করে কে জানে! তাছাড়া...

তাছাড়া মনে হচ্ছে, যেন আপনাকে কতদিন ধরে চিনি — আর ছোটমামা, বড়মামা, মেজমামিমা যেন আমার কত জন্মের আপনজন। তকাই তো আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ অবশ্যই। কিন্তু আপনি — এমনকী সাঁটুলও। এসব কি এই প্রাকৃতিক অভিঘাতের জন্যেই হল?

'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল' বলছেন?

বলে, চাপা হাসি হাসল হিমি।

এ কথা ঠিকই। এই প্রকৃতি যে কতখানি অঘটন—পটিয়সী তা শুধু সে নিজেই জানে।

তারপর বলল, কাল সকালে রোদ উঠলেই এই ঘোর কেটে যাবে না তো? আমাদের প্রতি আমার পরিবারের সকলের প্রতি এই ভাললাগাটা?

জানি না। কালকের কথা কালই জানে।

আমিও ভাবছি, ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্তটা কী করে হঠাৎ নিলাম। জীবনে অনেক ব্যাপারেই বছরের পর বছর ভেবেও কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্তু কোনও বিশেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-চমকের মতো পাকা হয়ে যায়। সত্যি! মানুষের মনের মতো দুর্জ্ঞেয় আর কি কিছু আছে!

তারপর দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।

আপনার কিন্তু একটা গান গাইবার কথা ছিল।

হিমিকা বলল, অনিকেতকে।

রাম্‌টা খেয়েনি। দু-তিনটি ড্রিঙ্ক-এর পর নিজের মধ্যের নানা অদৃশ্য বাঁধন যখন ঢিলে হয়ে যায়, যখন খুশি খুশি লাগে, তখনই শুধু গাইতে ইচ্ছে করে। গান গাইবার মতো মন কি সব সময়ে থাকে? আমি কি আর আপনার মতো গায়িকা!

'আমার মতো' 'আপনার মতো' বলে কোনও ব্যাপার নেই। যার মধ্যে গান আছ, যার কান আছে, তিনিই গায়ক। আসলে, মানুষ নিজের জন্যে। যতখানি গান করেন, মানে নিজের ভাললাগার জন্যে, তেমন তো অন্য কারও জন্যেই করতে পারেন না।

এটা ঠিকই বলেছেন আপনি।

বলেই, চুপ করে গেল অনিকেত।

ওপাশ থেকে তকাই-এর উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। বলল, আমাকে কী দেবে বল মেজমামি।

তকুদাটা বড্ড চেঁচায়। এই সন্ধের শান্তিটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিল।

অনিকেত বলল, আপনি কী ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম, আমার ফিরে যাবার তো সবই ঠিক ছিল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর ফ্লাইটের রিটার্ন টিকিটও নিয়ে এসেছি। অফিসের গাড়ি আসবে

এয়ারপোর্টে। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। তবে একবার যেতে তো হবেই, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে আনতে, গ্রাচুইটি, পি এফ, শেয়ার সব সেটল করতে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তো। কিছু শেয়ারও দিয়েছিল। শিকড় বেশ গভীরেই ছড়িয়েছিলাম। আমার জি. এম. তো হাত-পা ছুঁড়বেন। বলবেন, ইউ হ্যাভ গান ক্রেইজি।

তারপর বলল, দেখি। আপনি যদি আমাদের পরিবারের এই যজ্ঞে শামিল হন তাহলে আমারও শামিল না হওয়াটা খুবই খারাপ দেখাবে। বিবেক থাকে বলে, "দংশন" করবে।

খারাপ দেখাবে বলেই আসবেন না। মন থেকে আসবার তাগিদ বোধ করলেই আসবেন।

সেটা ঠিক।

ইতিমধ্যে তকাই আর সাঁটুল ফিরে এল। এসেই তকাই বলল, এই সাঁটুল আমার বন্ধুকে দেখছিস না। দ্যাখ গ্লাস খালি হয়ে গেছে কি না?

সাঁটুল অনিকেতের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিল। দোলের তো মাত্র আটদিন বাকি। দু'দিন পর গিয়ে আবার ফিরে আসবি, না থেকেই যাবি ভেটকু?

না না, অনেক কমিটমেন্টস আছে। তাছাড়া, মা তো একা থাকেন।

মাসিমা এখানে আসতে আপত্তি করবেন না তো?

তকাই বলল।

মনে হয় না। মা কলকাতাতে আর থাকতেও চান না।

সত্যি। কলকাতায় আর থাকা মুশকিলও। না গাড়িতে করে কোথাও যাওয়া যায়, না হেঁটে। প্রশ্বাসও তো নেওয়া যায় না, যা পলিউশন। নেহাত রুজি-রোজগারের জন্যেই থাকতে হয় মানুষের। তাছাড়া এখানে তোদের মামাবাড়িতে একটা ধার্মিক আবহাওয়া আছে, পুজো-আচ্চা, দোল-দুর্গোৎসব, মায়ের ভালই লাগার কথা।

তারপর বলল, কিন্তু আমি এলে মাকে নিয়ে থাকব কোথায়?

কেন? মামাবাড়িতে?

তকাই বলল।

না, তা কেন? সেটা অনিকেতবাবু এবং তাঁর মায়ের পক্ষে সম্মানের হবে না। তবে থাকবার জায়গা জ্যাঠা-কাকার অবশ্যই বন্দোবস্ত করে দেবেন।

হিমি বলল।

তাহলে আমি তোর সঙ্গেই থাকব। আমার মা থাকবেন তাঁর দু'ভাই আর ভাই-বউ-এর সঙ্গে।

হিমির থাকার কথা স্বাভাবিক কারণেই উঠল না। হিমি চুপ করেই রইল।

একটা সিগারেট খাওয়া।

অনি বলল তকাইকে।

সিগারেট! তুই!

হ্যাঁ। ভীষণ টেনশন হচ্ছে।

তকাই খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিয়ে বলল, নে, খা।

এবারে গান গা একটা হিমি। আমি কিন্তু আজ ড্রাঙ্ক হয়ে যাব। জীবনের কোনও কোনও দিন ড্রাঙ্ক হওয়া দরকার।

সেটা ভাল। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে মিস্টার মুখার্জি আছেন। তিনি বলেন, যেদিন বৃষ্টি পড়ে সেদিন ড্রাঙ্ক হই আর যেদিন পড়ে না সেদিন।

তকাই আর অনিকেত হেসে উঠল।

গা হিমি। তুই খাবি নাকি একটা রাম্? ভেটকু যখন সিগারেট খাচ্ছে। তোর কোনও টেনশন হচ্ছে না তো?

না। কীসের টেনশন? আই অ্যাম ড্রাঙ্ক উইথ লাইফ।

ঠিক আছে। একটা গান গা না।

আচ্ছা গাইছি। বসন্তের একটি গান। যদিও সকালবেলার রাগে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথের গানের পর্যায় সব উনি ভাগ করেছেন বলেই খোদার ওপর খোদকারি করা উচিত নয় কিন্তু অনেক গানকেই অন্য পর্যায়েও সহজেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাই না?

অনিকেত বলল।

অবশ্যই। যে গানটি গাইছি সেটি বসন্তর গান কিন্তু প্রেমের গান বললেও কারও মারামারি করা উচিত নয়। তাছাড়া এটি সকালবেলার গান, তবুও গাইছি, মন যখন করেছি।

গা এবারে। বড় বেশি কথা বলছিস।

হিমি ধরল গান,

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো
ফুলের গন্ধে বাঁশির তানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু দিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে -
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥
তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে..."

গান শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অনিকেত। যেমন স্বরস্থাপনা, তেমন সুরজ্ঞান, তেমনই ভাব। এই গানটি বহু বড় বহু গাইয়ের গলাতেও শুনেছে। তাও যখন এতখানি ভাল লাগল তার মানে হিমি অবশ্যই ভাল গায়। খুবই ভাল গায়।

ভাবছিল অনি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিতদের গান। এখন সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তা দেখে ও শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁদের প্রাণের গান তাঁদের প্রাণে যে কতখানি আঘাত লাগে তা শুধু অন্য যাঁরা সেই রকম, তাঁরাই বোঝেন, জানেন।

হিমি বলল। ওই "বুর্জোয়া" কবির গানকে যে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ যথার্থ সম্মানের ও ভালবাসার সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই গানেই

আত্মনিবেদন করেছেন তা তাঁদেরই হয়ে থাকলে সুখের হত। সব কিছুরই 'জনগণায়ন' কোনও জাতির পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোদিনই আপামর জনগণের গান ছিল না। তেমন ভাবাটাও উচিত নয়। জনগণ জনগণোচিত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে থাকলেই সেটা সুখের হতো।

অনিকেতের আরও একটা কথা মনে এল। ওর মন বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন পরিবেশেই শুনতে হয়। হাজার আলো-জ্বলা কোনও শহরের কনসার্ট হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে ছেলেবেলায় শান্তি ছিল। তখন সেখানের পৌষোৎসবে কি বসন্তোৎসবে গান শুনলে প্রকৃতির ছোঁয়া তখনও পাওয়া যেত। কিন্তু আজকে ভিড়ের চোটে তা আর পাওয়া যায় না। অনির কাছে এ এক আবিষ্কার। হিমির গানটি যেন ওর মরমে বিঁধে গেল। এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নানারকম অভিঘাতও পরম আবিষ্কার।

তকাই বলল, গ্লাসটা ধর। বটমস্-আপ কর ভেটকু।

অনি বলল, হ্যাঁ। ভাবছি। আজকে আমিও ড্রাঙ্ক হব।

হিমি একবার তাকাল অনিকেতের মুখে।

তকাই বলল, আমার বোনের গান কেমন শুনলি তা তো বললি না?

সব জিনিস কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। বোঝানোর চেষ্টা করাও উচিত নয়।

তবে?

চোখের ভাষা দিয়ে বোঝাতে হয়।

এই সপ্তমীর শুক্লপক্ষের আলোতে তো অন্য মানুষের চোখ দেখা যায় না তেমন করে।

যে দেখতে জানে সে ঠিকই দেখে।

বুঝলাম। এবার তুই গা।

না। ওই গানের পরে অন্য গান আর হয় না। গানটির রেশ কেটে যাবে। অন্যদিন হবে।

তাহলে চল আমরা সকলে মিলে 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গাই'। আমার বডিও আজ গান চাইছে।

তকাই বলল।

হিমি হেসে বলল, ফাজিল কোথাকার।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটিও 'ক্লিশে' হয়ে গেছে সূর্যাস্তর ছবিরই মতো। গান যে গাইতে হবেই তার কি মানে আছে? একটু না হয় চুপ করেই থাক। প্রকৃতির কথা শুনি, রূপ দেখি।

অনি বলল।

আরে বাব্বা। এ যে দেখি 'গুরু গুড় চেলা চিনি'।

তারপর হেসে বলল তকাই, 'দুদিনের সন্ন্যাসী, ভাতকে বলে অন্ন'।

সাঁটুল বলল, আর পনেরো মিনিটি বসে তারপর গেলেই ভাল।

অনি বলল, ড্রাঙ্ক হয়ে বাড়ি ফিরলে মামারা কিছু বলবেন না? আর মামিমা?

খাওয়ার সময়ে তো মামিমা থাকবেনই।

মামারা বলবেন না, তবে মামিমাকে বলব, মামাদের খাইয়ে দিতে। বড়মামা তো সাড়ে আটটাতে খান। ছোটমামা জেগে থাকলেও কিছু হবে না। তাছাড়া ড্রাঙ্ক হবই বা কেন? ভদ্রলোকে কখনও ড্রাঙ্ক হয় না, 'হাই' হতে পারে কখনও কখনও।

যেমন তোরা ঠিক করবি।

তারপর বলল, চল, আমরা আবার চুপ করে থাকব, আগের মতো।

আবার যদি ভাল্লুক আসে।

হিমি বলল।

এলে আসবে।

সাঁটুল বলল।

আরও চারটে গুলি তো আছে রিভলবারের চেম্বারে। ভয় নেই। তাড়িয়ে দেব।

তাহলে সবাই চুপ।

অনিকেত বলল।

সেই রুপোঝুরি রাতে ঝিরিঝিরি ছায়ার মধ্যে চন্দ্রাহত হয়ে ওরা তিনজনে বসে রইল, মস্ত বড় কালো পাথরটার ওপরে। ওরা চুপ করতেই ঝরানার শব্দটা জোর হল। ভারি সুন্দর নাম ঝরনাটার। হৃদি-ঝোড়া। আস্তে আস্তে নানা রাত-পাখির ডাক স্পষ্ট হতে লাগল। অনিকেত হিমির মুখটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। তার কাটা-কাটা-নাক। চিবুক ঠাহর করতে পারল কিন্তু ওই স্বল্পালোকে তার চোখ পড়তে পারছিল না। আর চোখই তো মনের আয়না। মনের জানলা।

হিমিও তাকিয়ে ছিল অনড় হয়ে বসে অনিকেতের মুখে। যদি দেখতে পায় চোখ অনিকেতের, পড়তে পারে তার ভাষা।

একটা কপার-স্মিথ পাখি ডাকছিল ঝরনাতলার কাছ থেকে আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল পাহাড়ের নীচ থেকে। যে পাখিটা ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে ডাকে এমন চাঁদের রাতে রাতভর, সেটা ডাকা শুরু করল। সামনের জ্যোৎস্নালোকিত বিস্তীর্ণ ফাঁকা টাঁড়-এর ওপরে একটি একলা ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ ডেকে ফিরতে লাগল ডিড-ইউ-ড্যু-ইট-ডিড-ইউ-ড্যু-ইট করে।

কে যে কী করল, কেন করল, কেমন করে করল, তা কে জানে!

পাখিরাই শুধু জানে বুঝি। শুধু পাখি জানে। পাখিরা জানে।

ভাবছিল, হিমি।